শিক্ষা-সমালোচনা

শিক্ষা-বিজ্ঞান-প্রণেতা

শ্রীবিনয়কুমার সরকার এম্, এ

অধ্যাপক—রাষ্ট্রবিজ্ঞান, বেঙ্গল ন্যাশন্যাল কলেজ, কলিকাতা

কলিকাতা

১৫, কলেজ স্কোয়ার

চক্রবর্ত্তী চাটার্জ্জি এণ্ড কোং

১৯১২

মূল্য ১৲ টাকা মাত্র।

THE EDUCATIONAL CREED OF Prof. Benoy Kumar Sarkar

A. General

I. **Aim** and **Criterion** of Education twofold : the man must be (i) intellectually, a discoverer of truths and a pioneer of learning, (ii) morally, an organiser of institutions and a leader of men.

II. **Moral Training** to be imparted not through lessons culled from moral and religious text-books, but through arrangements by which the student is actually made to develop habits of self-sacrifice and devotion to the interests of others by undertaking works of philanthropy and social service.

III. To build up character and determine the aim or mission of life (i) the 'design,' plan and personal responsibility of a single guide-philosopher-friend, and (ii) the control of the whole life and career of the student are indispensable. These circumstances provide the pre-condition for true **Spiritual Education.**

IV. Educational Institutions and Movements must not be made planks in political, industrial, social or religious agitations and propagandas, but controlled and governed by the Science of Education based on the rational grounds of **Sociology.**

B. Tutorial

I. Even the most elementary course must have a **Multiplicity** of subjects with due inter-relation and co-

ordination. Upto a certain stage the training must be encyclopædic and as comprehensive as possible.

II. The mother-tongue must be the **Medium** of instruction in all subjects and through all standards. And if in India the provincial languages are really inadequate and poor the educationists must make it a point to develop and enrich them within the shortest possible time by a system of patronage and endowments on the 'protective principle.'

III. The *sentence*, not word, must be the basis of Language-training, whether in Inflexional or Analytical tongues—even in Sanskrit ; and the **Inductive Method** of proceeding from the known to the unknown, concrete to the abstract, facts and phenomena to general principles, is to be the tutorial method in all branches of learning.

IV. Two Foreign languages besides English and at least two provincial vernaculars must be made compulsory for all **Higher Culture** in India.

C. **Organisational**

I. **Examinations** must be daily. The day's work must be finished and tested during the day. And terms of academic life as well as the system of giving credit should be not by years or months but according to subjects or portions of subjects studied. Steady and constant discipline, both intellectual and moral, are possible only under these conditions.

II. The **Laboratory** and Environment of student-life must be the whole world of men and things. The day's routine must therefore provide opportunities for self-sacrifice, devotion, recreations, excursions, etc, as well as pure intellectual work. There should consequently be no long holidays or periodical vacations except when necessitated by pedagogic interests.

সূচী

শিক্ষা-সমালোচনা

মনুষ্যত্বলাভের সোপান

আজকাল আমাদের দেশে শিক্ষা সম্বন্ধে নানা রকমের আন্দোলন চলিতেছে। শিক্ষাসমস্যা কেবল বিদ্যালয়ের চতুঃসীমার মধ্যে আর আবদ্ধ নয়। ইহার গুরুত্ব সকলেই ক্রমশঃ বুঝিতেছেন, এবং ছাত্রজীবনের কর্ত্তব্য, শিক্ষাপ্রণালী প্রভৃতি বিষয়ে মতামত প্রকাশ করিতেছেন। দেশময় এরূপ শিক্ষার আন্দোলন অতি আশাপ্রদ। ইহাতে বুঝা যায় আমাদের দেশের লোকেরা ছেলেদের ভবিষ্যৎ জীবনের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া শৈশবাবস্থা হইতেই তাহাদিগকে প্রকৃত মঙ্গলের পথে চালিত করিবার জন্য জাগ্রত হইয়াছেন, এবং এ জন্য দুই একজন শিক্ষকের হাতে শিক্ষার সম্পূর্ণ দায়িত্ব প্রদান করিয়া তাঁহারা নিশ্চেষ্টভাবে বসিয়া থাকিতে ইচ্ছুক নন; বরং নিজে নিজেই এই কঠিন বিষয়ের যতটুকু মীমাংসা করিতে পারেন, আগ্রহের সহিত তজ্জন্য সময় ব্যয় ও পরিশ্রম করিতেছেন।

আমাদের অনেকেই শিক্ষাকে টাকা রোজগারের উপায় হইতে তফাৎ করিতে পারেন না। অর্থকরী না হইলে তাঁহারা বিদ্যার মূল্য দান করেন না। তাঁহারা বিদ্যাশিক্ষাকে কেবলমাত্র অর্থোপার্জ্জনেরই পন্থা মনে করেন। এজন্য সকল বিষয়ই ঐদিক হইতে বুঝিতে চেষ্টা করিয়া থাকেন। কয়টা চাকরীর পথ আছে—কি কি ব্যবসায় অবলম্বন করার সুযোগ আছে—কোন্ কোন্ পথ অবরুদ্ধ নয়—কেবল এ সব প্রশ্নের বিচার করিয়া তবে শিক্ষার প্রশ্নে হাত দেন। কিন্তু এভাবে দেখিলে শিক্ষাপদ্ধতি অতি নীচ জিনিষ হইয়া পড়ে। ইহার প্রকৃত স্থান অতি উচ্চ। কেবল টাকা রোজগারই ইহার উদ্দেশ্য নয়। অথবা সমাজে বৈষয়িক উন্নতি ও প্রতিপত্তিই ইহার একমাত্র লক্ষ্য নয়।

শিক্ষাপদ্ধতি ও অন্ন-সংস্থানের ব্যবস্থা

অবশ্য মানুষ যখন শরীরী তখন শরীরধারণের জন্য আর্থিক উন্নতি দরকারী বটেই। এইজন্য যে শিক্ষাপদ্ধতিই অবলম্বন করা হউক না কেন, তাহা শিক্ষার্থীর সমস্ত ভবিষ্যৎ লক্ষ্যের সঙ্গে মিলাইয়া করিতে হইবে। বাল্যকালের শিক্ষায় যে ফললাভ হয়, তাহারই সাহায্যে যখন জীবনের সমস্ত কর্ত্তব্যের জন্য উপযোগিতা লব্ধ হইয়া থাকে, তখন শিক্ষার ব্যবস্থার সঙ্গে ভবিষ্যতের খাওয়া পরার কথাটারও মীমাংসা হওয়া প্রয়োজন। যখন ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত হওয়া যাইতেছে, সেই অবস্থায়ই অর্থ রোজগারের উপায়টাও দেখা উচিত।

সুতরাং ভবিষ্যতে জীবন কোন্ কাজে সমর্পণ করা হইবে,

এই বিষয় স্থির করিয়া প্রত্যেককে শিক্ষার বিষয় স্থির করিতে হইবে ;—তাহা না হইলে বিজ্ঞানে বা ইতিহাসে এম্ এ পাশ করিয়া অথবা গণিতের Research scholar হইয়া পরে ডেপুটী গিরি বা ওকালতী করার মত একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার ঘটিবে। যদি বিজ্ঞানচর্চ্চাই জীবনের লক্ষ্য হয় এবং তদ্দ্বারাই যতটুকু বিষয়-সম্পত্তি হইতে পারে, তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকা যাইবে এইরূপ ভাবা যায়, তাহা হইলে ছেলেবেলা হইতেই তাহার জন্য প্রস্তুত হওয়া উচিত। এ উপায়েই বিজ্ঞান কেবল একটা বাজে জিনিষ বা পুঁথি-গত বিদ্যা বা বিজ্ঞানাগারের পরীক্ষা মাত্র না হইয়া প্রকৃত জীবন্ত সত্যরূপে মনে স্থান পাইতে পারে। এই শিক্ষাই সুখপ্রদ—ইহাতে মস্তিষ্কের অল্প সঞ্চালনেই জ্ঞানলাভ অধিক হয়।

অতএব টাকা পয়সা রোজগার বা খাওয়া পরার কথাটাকে একেবারে উড়াইয়া দিবার প্রয়োজন নাই। বরং শিক্ষাকেই তাহার উপযোগী করিয়া তুলিতে হইবে। এজন্য ছাত্রজীবনকে পরজীবনের স্বাভাবিক সোপানের মত দেখিতে হইবে ; যাহাতে বাল্য জীবনের সঙ্গে প্রবীণ বয়সের একটা ঘনিষ্ঠ ও স্বাভাবিক সম্বন্ধ থাকে, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। এইরূপে শেষ লক্ষ্য স্থির না করিয়া কার্য্য আরম্ভ করিলে বিদ্যার্জ্জনেও আন্তরিকতা থাকে না, আর অর্থোপার্জ্জনও মনের মত হয় না।

যাঁহারা লেখাপড়াকে কেবল অর্থোপার্জ্জন ও খাওয়াপরার সহায় মাত্ররূপে আদর না করিয়া মনুষ্যত্ববিকাশের উপায় বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা শিক্ষা সম্বন্ধে যাহা বলেন, তাহা অনেক সময়ই

গ্রহণীয় বটে; কিন্তু মানুষের পূর্ণতা কিসে হয় তৎসম্বন্ধে অনেকেরই স্পষ্ট ধারণা আছে কি না সন্দেহ। সকাল হইতে আরম্ভ করিয়া সর্ব্বদা বই পড়া, বা লেখাপড়ার আলোচনা করা, Debating clubএর জন্য রচনা লেখা বা প্রবন্ধ পাঠ করা ইত্যাদি তাঁহাদের মতে ছাত্রদের একমাত্র কর্ত্তব্য।

কাজ করিবার শক্তির বিকাশ এবং বৃদ্ধি হওয়াও যে ছাত্র-জীবনেই দরকার তাহা অনেকের মনে থাকে না। কেবল পঠদ্দশায় কর্ম্মজগতে কতকগুলি সুন্দর ভাব গ্রহণ করিলেই কর্ত্তব্য আধিপত্য বিস্তারের সাধিত হয় না; অনেকের সঙ্গে মিলিয়া আয়োজন মিশিয়া বহুবিধ বাধাবিপত্তি ও মতভেদ প্রভৃতির মধ্যে থাকিয়া স্থিরচিত্তে কাজ করিতে শিক্ষা করাও আবশ্যক। এজন্য প্রথম হইতে কার্য্যকরী শক্তিগুলির অনুশীলন করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে কার্য্যের ক্ষেত্র এবং স্বাধীন ক্রিয়া-শক্তির উপযুক্ত প্রয়োগস্থল প্রস্তুত করিয়া দেওয়া শিক্ষাগুরুদের কর্ত্তব্য। এই উপায়েই স্বভাব দৃঢ় ও কার্য্যতৎপর হয়। প্রকৃত নৈতিক উন্নতি অন্য কোন উপায়ে হইতে পারে না। অনেকের সঙ্গে এক দলে প্রবেশ করিয়া একই উদ্দেশ্যে কাজ করিতে হইলে যত সহিষ্ণুতা, ত্যাগস্বীকার ও ধৈর্য্যের প্রয়োজন হয়, আর কিছুতেই তাহা হয় না। পুঁথির সদুপদেশ বা বক্তৃতার বলে মানুষকে এ সব গুণ শিখান যায় না। এজন্য এমন কর্ম্মক্ষেত্রের আবশ্যক, যেখানে বালকেরা স্ব স্ব অবস্থা ও সামর্থ্যানুসারে নিজ নিজ চিন্তা ও কর্ম্ম দ্বারা কোন কিছু গড়িয়া তুলিবার সুবিধা পায়। এই

উপায়ে কাজ করিতে করিতেই ভবিষ্যতে দলবদ্ধ ভাবে কোন বৃহৎ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ এবং স্বাধীন কর্ম্মের অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি প্রভৃতির জন্য শিক্ষার্থী প্রস্তুত হইতে পারে।

বস্তুতঃ মানসিক বৃত্তিগুলি বাহিরের কর্ম্মে প্রয়োগ করিবার সুবিধা না থাকিলে মানসিক শক্তিরও বৃদ্ধি হয় না। মন ক্রমশঃ হীনতেজ ও পঙ্গু হইয়া যায়। কর্ম্মক্ষেত্র হইতে পোষণোপযোগী রস গ্রহণ করিতে পারিলেই মন সবল, দৃঢ় ও সজীব হয়। দায়িত্বের কাজ করিতে করিতেই দায়িত্বগ্রহণের শক্তি জন্মে। সুতরাং প্রকৃত শিক্ষা কেবল তাহাই, যাহাতে মনকে ভাবে পরিপূর্ণ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই সেই ভাবকে কার্য্যে পারিণত করিবারও ব্যবস্থা করিয়া দেয়।

মনুষ্যজীবনে ত কেবল ভাবেরই আদান প্রদান করিতে হয় না—অনেক কর্ম্মও করিতে হয়। পরিবারে ও সমাজে থাকিতে হইলে অনেক কষ্ট ও ক্ষতিস্বীকার করিয়া চলিতে হয়—অনেক পরোপকারের প্রয়োজন হয়। সেই কঠোর কর্ত্তব্যময় জীবনের জন্য যে অবস্থায় মানুষকে প্রস্তুত করা হইতেছে—তখনই অর্থাৎ এই পঠদ্দশাতেই সংসারের যাবতীয় কাজে মানুষের মনোনিবেশ করান আবশ্যক। তাহা না হইলে ভবিষ্যতের জন্য উপযুক্ত হওয়া যায় না—পরে ভুগিতে হয়—সামান্য সামান্য বিষয়েও পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হয়। আর ছাত্রজীবনেই কর্ম্ম করিবার সুযোগ পাইলে প্রধান লাভ এই হয়, যে প্রথম হইতেই স্বাধীন কর্ম্মের আকাঙ্ক্ষা ও শিক্ষা হইয়া থাকে, এবং তাহার ফলে ভবিষ্যতে

অনেক লোককে একমতে আনিয়া সকলের মধ্যে ঐক্য ও সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া বড় বড় কাজ করিবার যোগ্যতা জন্মে।

আমাদের দেশের লোকেরা এই কাজ করিবার ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষাকে তত আদর করেন না, এমন কি, ইহাকে শিক্ষার কোন অঙ্গের মধ্যেই গণ্য করেন না। এইরূপে শিক্ষা একেবারে অন্তঃসারশূন্য ও কষ্টজনক হইয়া পড়িয়াছে। এ জন্যই ইতিহাসের উপদেশে আমাদের মনে ঔৎসুক্য জন্মাইতে পারে না, ভূগোল অতি শুষ্ক নীরস বিষয় বলিয়া মনে হয়, সংস্কৃত শিক্ষার দরকার নাই অনেক ছাত্রেরই এরূপ ধারণা হইয়াছে। অনেকই হয়ত গণিতের "লেখা অঙ্ক"কে বাঘের মত ভয় করে। ফলকথায় বিদ্যা গ্রন্থগত জিনিষ হইয়া পড়িয়াছে—যেন জীবনের প্রতিদিনকার কাজের জিনিষ নয়। সর্ব্বদা সকল সময়ে সকল সমাজে অর্জ্জিত বিদ্যা ব্যবহার করা কঠিন হইয়া পড়িয়াছে—কেবল পরীক্ষাগার আর গ্রন্থের সম্মুখে না বসিলে অথবা খাতা বা পুঁথির কোন্ জায়গায় আছে ঠিক "localise" না করিতে পারিলে একেবারে মহাবিপদে পড়িতে হয়। ইহার অর্থ আর কিছুই নয়—জ্ঞান মনের অঙ্গীভূত না হইয়া বাহিরে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

আর বই-পড়া সম্বন্ধেও অনেকের তত ভালরকম ধারণা নাই। লেখাপড়াই তাঁহাদের মতে ছাত্রদের একমাত্র তপস্যা হওয়া উচিত বটে, কিন্তু কি উপায়ে তাহাই প্রকৃত শিক্ষার উপকরণ হইতে পারে, তাহা বুঝিতে অনেকেই চেষ্টা করেন না। স্বাধীন চিন্তা করিতে না

স্বাধীন চিন্তার সুযোগ বিধান

পারিলে যে অন্যের দত্ত মনের ভাব নিজের মনে স্থান লাভ করিতে পারে না, তাহা বুঝা উচিত। কেবল উদরসাৎ করিলেই শরীরের পুষ্টিসাধন হয় না। শরীরকে পুষ্ট করিতে হইলে খাদ্যকে রক্তমাংসরূপে পরিণত করা চাই। শরীরকে সুস্থ ও স্বাভাবিক অবস্থায় রাখা প্রয়োজন। তাই মনকে স্বাধীন ভাবে কাজ করিতে অবসর না দিলে বই-পড়া বা পরের উপদেশ গ্রহণও সম্ভবপর হয় না। এতদ্ব্যতীত, স্বাধীন চিন্তা করিতে না পাইলে মনোবৃত্তির বিকাশই হয় না। সর্ব্বদা যদি চর্ব্বিতচর্ব্বণ বা মুখস্থই আওড়াইতে হয়, তবে ধীশক্তির সঞ্চালন হয় কখন? তাই এরূপ ব্যবস্থা করা দরকার যাহাতে ছাত্রগণ নিজ নিজ মনের ভাব প্রকাশ করিয়া যথার্থ উপকার লাভ করিতে পারে। সেজন্য কেবলমাত্র অন্যে কি বলিতেছে—বা অমুক ব্যক্তির কি মত—শুধু ইহাই বুঝিয়া বা জানিয়া কখনও নিশ্চিন্ত হইয়া থাকা উচিত নয়। প্রত্যেক বিষয়েই—ভাষা, সাহিত্য, গণিত, ইতিহাস—প্রত্যেক জ্ঞাতব্য ব্যাপারেই মনুষ্যজাতির জ্ঞানভাণ্ডারে 'আমারও কিছু অর্পণ করিবার আছে' এই ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া বিদ্যালয়ে প্রবেশ করা শিক্ষার্থীর কর্ত্তব্য।

এইরূপ স্বাধীন চিন্তার উদ্রেক না করিয়া দিতে পারিলে শিক্ষার আয়োজনকে প্রশংসা করা যায় না। তাহা ছাড়া নিজের দেশের, জাতির ও সমাজের সভ্যতা, ইতিহাস ও রীতিনীতি শুধু পরের কাছে বিদেশীয় গ্রন্থে পড়িয়াই সন্তুষ্ট থাকা উচিত নহে, 'নিজে স্বদেশের ইতিহাসকে সত্যভাবে পড়িব ও যথার্থ ইতিবৃত্তের

অনুসন্ধান করিয়া আমাদের এই স্বতন্ত্র সভ্যতা উদ্ধার করিতে যত্নবান্ হইব'—এ ভাব যদি ছাত্রদের না হয়, তাহা হইলে শিক্ষাকে প্রকৃত শিক্ষা বলা যায় না। যদি দাক্ষিণাত্যের কথা বা মহারাষ্ট্রীয় কবিদের রচনা বা তামিল ও তেলুগু ভাষার প্রসঙ্গ ভারতবাসীর কাছে New Zealandএর বর্ত্তমান সভ্যতা বা Peruর পুরাবৃত্তের মত বোধ হয়, তবে যতই দেশে Research scholarএর বৃদ্ধি হউক না কেন, যতই M. Sc. Ph D. হউক না কেন, যতই Political philosophy পড়া যাউক্, দেশের শিক্ষা অসম্পূর্ণ, একথা বলিতেই হইবে।

তাই স্বাধীন ক্রিয়া ও স্বাধীন চিন্তাশক্তির উদ্রেক করিতে না পারিলে শিক্ষার উদ্দেশ্য সাধিত হয় না এবং শিক্ষাকে সম্পূর্ণ মনুষ্যত্ববিকাশের উপায় বলা যায় না।

শিক্ষাপ্রণালীতে জাতীয় চরিত্রের মর্য্যাদা

এজন্য সকল দেশের সকল সময়ের শিক্ষার ব্যবস্থাকে জাতীয় ভাবে গঠন করা প্রয়োজন। ছাত্রের মনে যে স্বাভাবিক ভাবপুঞ্জ আছে তাহার সদ্ব্যবহার করিতে হইলে বিদেশীয় প্রথার বা একেবারে অপরিচিত বস্তুর ঘনিষ্ঠতায় উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। দেশের মধ্যে যে নিয়ম ও আদর্শ আবহমান কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, শিক্ষাপ্রণালী তাহার উপযোগী না হইলে ছাত্রের মনে নীরসতার ভাব আসে। তাহাতে শিক্ষার বিষয় হৃদয়ের উপর আধিপত্য স্থাপন করিতে পারে না। জোড়াতালি দিয়া একটা কৃত্রিম শিক্ষার বোঝা চাপান হয় মাত্র। তাই দেশকে যত জায়গায় উপলব্ধি করা যায়—ধর্ম্ম, সমাজ, রীতিনীতি, তীর্থ,

শিল্প, কারুকার্য্য, মেলা, উৎসব, মহাপুরুষ—সকলের সঙ্গে সংযোগ রাখিয়া শিক্ষা দিতে হইবে।

শিক্ষাসঙ্ঘগঠন

এজন্য আর একটা জিনিষের দরকার। দেশের লোকের দ্বারা শিক্ষা চালিত হওয়া উচিত। অন্য লোক যত শুভাকাঙ্ক্ষীই হউন না কেন, তাঁহাদের মনের গতির সঙ্গে আমাদের মনোবৃত্তির মিল কখনই এক হইতে পারে না। একজাতি অপর জাতির হৃদয়ের কথা ভাল রকম বুঝিতে পারে না। তাই হাজার সদিচ্ছায় কাজ আরম্ভ করিলেও পরে কাহারও কাজ করিয়া সুখ দিতে পারে না। স্বাধীনভাবে স্ব স্ব অভাব আপনারাই মোচন করিয়া লইতে না পারিলে মনের মত ফল পাওয়া যায় না। আর পরে করিয়া দিলে নিজের লাভই বা কি? সমস্ত দেশের শিক্ষার ভার দেশের লোকের হাতে রাখিতে যে শক্তির দরকার, তাও ত একটা শিক্ষার প্রধান জিনিষ।

তাই প্রকৃতভাবে শিক্ষা প্রদান করিতে হইলে বাল্যাবস্থায়ই ভবিষ্যতের লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে এবং অতি স্বাভাবিক ও সহজভাবে গ্রহণীয় বিষয় গুলি শিক্ষা দান করিতে হইবে। এজন্য যে শিক্ষাসঙ্ঘ শিক্ষার্থীকে সমাজের যাবতীয় চিন্তা ও কর্ম্মের মধ্যে থাকিবার সুবিধা করিয়া দেয়, এবং তরুণ বয়সেই কর্ম্মের উপর আধিপত্য স্থাপনের আকাঙ্ক্ষা জন্মায় তাহারই প্রতিষ্ঠার আয়োজন করা আবশ্যক।

চিন্তায় মৌলিকতা

ছাত্রজীবনকে ভবিষ্যৎ জীবনের সোপানের মত দেখা উচিত। অতএব পঠদ্দশায়ই অন্যান্য শিক্ষার সঙ্গে জীবিকা অর্জ্জনের শিক্ষাও হওয়া চাই। এদিকে কাজের অনুষ্ঠানের মধ্যে না থাকিতে পারিলে ক্রিয়া-শক্তির বিকাশ হয় না; এবং প্রকৃত নৈতিক শিক্ষা ও চরিত্র গঠনের জন্য ক্ষতিস্বীকার ও স্বার্থত্যাগ করিবার আয়োজনও আবশ্যক। তাই সমাজ ও জাতির বিবিধ কাজে প্রত্যেক ছাত্রেরই মনোনিবেশ করা কর্ত্তব্য। অতএব যাহাতে পরার্থে কিছু কিছু সময় দান করা যায়, এরূপ অনুষ্ঠানে যোগদান ছাত্রজীবনের শিক্ষার প্রধান উপকরণ।

আবার কেবল পরের উপদেশ গ্রহণ করিয়া তাহাকে উদ্গীরণ করিতে পারিলেই সুশিক্ষা হয় না। নিজের চিন্তাশক্তি দ্বারা জীবনী শক্তির কার্য্য ও নিজের উপযোগী করিয়া লইতে না শিখিলে পরিচয় বই এর কথা মনে লাগে না, আর বিদ্যা জীবনের জিনিষ না হইয়া বাহিরের জিনিষ বলিয়া বোধ হয়। কোন্ উপায়ে লেখাপড়া করিলে কেবল পরের কথা দ্বারা চালিত না হইয়া সেই সকলকে নিজের মত করিয়া বুঝিতে ও তাহাদের উপর স্বকীয় বিশেষত্বের ছাপ মারিতে পারা যায় এবং নিজের চিন্তাশক্তির পরিচয় দিয়া স্বাধীন চিন্তার বিকাশ করা যায়, তাহার ব্যবস্থা করার প্রয়োজন। আলোক উত্তাপ

প্রভৃতি বাহিরের যত শক্তি আছে জীবজগৎ যদি কেবল তাহাদের ক্রিয়া ও অভিনয়েরই বস্তু হয় এবং প্রতিক্রিয়া দ্বারা তাহাদিগকে রূপান্তরিত করিয়া স্বকীয় ব্যবহারে প্রযুক্ত করিতে না পারে, তাহা হইলে আর তাহা জীবন্ত বলা যায় না। কেবল আদান বা গ্রহণ করিতে পারিলেই যথেষ্ট হইল না। প্রকৃত জীবনের প্রধান লক্ষণ প্রদান করারও শক্তি। শিক্ষার্থীর বাহিরে যে ভাবরাশি রহিয়াছে, যত শক্তির অভিনয় হইতেছে, মনুষ্যত্ব বিকাশের যত উপাদান আছে, গ্রন্থ, পুস্তকাগার, প্রদর্শনী, মিউ-জিয়াম, সামাজিক জীবন—সকল গুলির সাহচর্য্যে ও সংঘর্ষে যথার্থ শিক্ষালাভ করিতে উপযুক্ত ও সমর্থ হওয়া বাঞ্ছনীয়। নিজের মনকে কেবল মাত্র অপরের ক্রীড়াপুত্তলী না হইতে দিয়া, সচেষ্ট ভাবে এই সব শক্তি ও ভাবসমষ্টির উপর কাজ করিতে পারা আবশ্যক।

মনকে এরূপ কর্ম্মঠ ও সজাগ করার প্রধান উপায়—যখনই যা পড়ি বা শুনি, সেই পড়া বা শুনার জিনিষের প্রতি অকপট শ্রদ্ধা

স্বাধীন চিন্তা বিকাশের উপায়

থাকা। কেবল বিদ্যাভ্যাস কেন, পৃথিবীর সমস্ত কাজেরই সুসাধনের জন্য তৎপ্রতি আন্তরিকতা চাই। প্রত্যেক কাজকেই তাহার নিজের জন্য আদর করিতে না পারিলে তাহার প্রতি সমুচিত যত্ন করা যায় না। লেখাপড়াও যদি তাহার নিজের জন্যই আদৃত হয়, তবে ইহাতে প্রকৃত ভাবে চিন্তাশক্তির অনুশীলনের প্রবৃত্তি হয়। আমি ভাষা শিক্ষা করিতেছি, কিন্তু এই ভাষাশিক্ষার ফলে সমাজে

আমার কিরূপ স্থান হইবে অথবা ইহাতে যথেষ্ট অর্থ রোজগার হইবে কি না সর্ব্বদা যদি এইরূপই ভাবি, তবে ভাষায় ব্যুৎপন্ন হইতে যত চেষ্টা, যত পরিশ্রম ও যত ইচ্ছার দরকার তাহা কখনই হইতে পারে না। এ স্থলে প্রকৃত প্রস্তাবে চাই আমি মানসম্ভ্রম বা টাকাপয়সা ;—ভাষাশিক্ষা আমার উদ্দেশ্য নয়। যদি অন্য কোন উপায়ে এসব জিনিষ পাওয়া যাইত, তবে ভাষাশিক্ষারূপ ধৃষ্টতা হয়ত ছাড়িয়াই দিতাম। এরূপ অবস্থায় ভাষার প্রতি অনুরাগ থাকিতে পারে না এবং নিজের একটু ভাবিবার প্রবৃত্তিও জন্মিতে পারে না। কারণ এশিক্ষার ফলাফলে আমার ভাল মন্দ কিছুই হয় না। কেবল পরীক্ষায় নম্বর পাবার মত যথেষ্ট জ্ঞান হইলেই হইল,—তজ্জন্য আত্মশক্তির অনুশীলন যে করিতে হইবেই এমন কোন কথা নাই। তাই ইতিহাসই পড়ি বা বিজ্ঞানই পড়ি, এই ইতিহাস বা বিজ্ঞান জীবনের উদ্দেশ্য না হইয়া অপরবিধ উদ্দেশ্যের অধীন হইলে অন্যে যে ভাবে বুঝায় সেই ভাবেই বুঝিতে চেষ্টা হয়, নিজের মত করিয়া বুঝিবার দরকার আছে মনে হয় না, কারণ সে রকম বুঝায় বিশেষ কিছু লাভ নাই ; অথবা পরের উপদেশই শিরোধার্য্য করিয়া লইতে হয়, তাহার উপর যুক্তিতর্কপ্রয়োগের পরিশ্রম কষ্টকর বোধ হয়। তাই যে বিষয়ই আলোচনা করিতে ইচ্ছা করা যাউক না কেন, সেই বিষয়ই ভবিষ্যতেও আলোচনা করিতে হইবে, এভাবে আরম্ভ করা উচিত। তবেই নিজের মৌলিকতা ও স্বাধীনতা রক্ষা করিবার ইচ্ছা হইবে। ইতিহাসকে নিজের চোখে দেখিতে চেষ্টা করিতে পারা

(১)
আলোচ্য বিষয়ের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা

যাইবে। নিজে বৈজ্ঞানিক হইতে প্রয়াস জন্মিবে। বাহ্য জগতের সমস্ত দৃশ্য ও শ্রাব্য পদার্থের প্রতি চক্ষুকর্ণ ধাবিত হইতে থাকিবে, এবং তাহাদের শৃঙ্খলা ও নিয়ম নির্দ্ধারণ করিতে প্রবৃত্তি হইবে। স্বদেশের ইতিহাস সম্বন্ধে পরের মতের অপেক্ষা না করিয়া প্রকৃত সত্যনির্ণয় করিতে নিজেই যত্নবান্ হইতে পারা যাইবে।

(২) আলোচ্য বিষয়ই অন্ন-সংস্থানের উপায় হওয়া আবশ্যক

তাই 'লেখাপড়া শেষ করিয়া উকীল হইব বা ডেপুটি হইব' এ ভাবে বিদ্যালয়ে প্রবেশ না করিয়া যে বিদ্যা আরম্ভ করা গেল, তাহারই আলোচনায় জীবন কাটাইব এরূপ ভাবিলে শিক্ষণীয় বিষয়ের যথোচিত আদর করা হয়। আর এ উপায়ে যত অর্থ রোজ-গার হয়, তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিব এরূপ ভাবিতে হইবে। অন্য উপায়ে খাওয়া পরার বন্দোবস্ত করিতে হইলে বিদ্যাশিক্ষা মনের প্রথম স্থান অধিকার করিতে পারিবে না। বাজে জিনিষের প্রতি মন আকৃষ্ট হইলে বা বড় বড় চাকরী বা অন্য কোন রূপ প্রলোভনের জিনিষ সর্ব্বদা চোখে থাকিলে লেখা-পড়ার প্রতি মনোযোগ শিথিল হয়—মন চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হয়, বিজ্ঞান বা সাহিত্য সমস্ত চিন্তাশক্তির কেন্দ্রস্থলে থাকে না। অতএব লেখাপড়াকে যদি অন্য কোন উদ্দেশ্য সাধনের উপায় মনে না করিয়া জ্ঞানবিকাশের উপায় মনে করা যায়, এবং এই জ্ঞানের দ্বারাই জীবনের সকল প্রকার সার্থকতালাভ হইল ভাবিতে পারা যায়, তাহাহইলেই বিদ্যাভ্যাসের সময় সকল বিষয়ে নিজের

মতামত প্রকাশ করিয়া প্রকৃত সত্য নির্ণয় করিতে যে স্বাধীন চিন্তার প্রয়োজন, তাহার প্রয়োগ করা সম্ভবপর হয়।

(৩) পরীক্ষা পদ্ধতির বিশেষত্ব

'ছাত্রজীবনে যে শিক্ষা লাভ করিলাম, সেই শিক্ষা দ্বারাই ভবিষ্যৎ জীবনের সকল প্রকার কর্ত্তব্য সাধন করিব,' এরূপ ইচ্ছা কাজে পরিণত করিতে হইলে শিক্ষার ব্যবস্থার কিছু বিশেষত্ব চাই। শিক্ষা-প্রণালীর মধ্যে পরীক্ষার পদ্ধতি একটী প্রধান জিনিষ। পরীক্ষার নিয়মের ভাল মন্দের উপর সুশিক্ষা কুশিক্ষা নির্ভর করে। যদি এরূপ হয় যে সমস্ত বৎসর লেখা পড়া না করিয়া ও শেষ কয়েকমাস অত্যন্ত পরিশ্রম করিলেই বেশ খ্যাতির সহিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া যায়, তাহাহইলে ফাঁকি দিবার প্রবৃত্তিকে সহায়তা করা হয়। এইজন্য প্রতিদিনকার বিদ্যাভ্যাস যে উপায়ে উৎসাহিত হয়, সেইরূপ বন্দোবস্ত করা দরকার। কেবল বৎসরান্তে তিন চারি দিনের পরীক্ষাই প্রধান না করিয়া দৈনিক কাজের পরীক্ষার ফলও গ্রহণ করা আবশ্যক। ইহাতে ছাত্রেরা স্বাভাবিক ভাবেই নিয়মিত রূপ কাজ করিতে বাধ্য হয়।

অনেক সময় আবার এরূপও হয় যে ছাত্রেরা বিদ্যাচর্চ্চাকে উদ্দেশ্য না করিয়া পরীক্ষাকেই লেখাপড়ার লক্ষ্য করিয়া ফেলে। তখন প্রকৃত জ্ঞানের দিকে দৃষ্টি থাকেনা, পরীক্ষার প্রশ্ন প্রভৃতির প্রতিই মন আকৃষ্ট হয়। পরীক্ষা জ্ঞান ও বুদ্ধি মাপিবার একটী উপায় মাত্র না থাকিয়া বিদ্যালাভের প্রধান লক্ষ্য হইয়া পড়ে। এ রকম দোষাবহ পরীক্ষার নিয়মাধীনতায় নিজ শক্তির প্রতি মনো-

যোগী হইতে সুবিধা থাকে না। আর, পরীক্ষা দ্বারা ঠকাইবার অভিসন্ধি যদি থাকে, তাহা হইলে প্রকৃত জ্ঞানের বিচার করা হয় না। শিক্ষার্থীর যথার্থ শিক্ষা কতটুকু হইল, কেবল চর্ব্বিত চর্ব্বণই না করিয়া নিজে কিছু বলিতে বা লিখিতে পারে কি না, তাহা স্থির করিতে হইলে পরীক্ষার ব্যবস্থা এরূপ হওয়া চাই যে ছাত্রেরা ভুল করিবার ভয়ে জড় সড় না হইয়া মন খুলিয়া নিজের বক্তব্য প্রকাশ করিতে পারে।

এরূপ না হইলে পরীক্ষায় জ্ঞানালোচনার সহায়তা না হইয়া বাধাই হয়, "Out books" পড়ায় আর text books পড়ায় একটা বিরোধ আছে মনে হয়। বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যেই আবদ্ধ থাকিতে প্রবৃত্তি হয়। একটুকু বাজে বই পড়িতে গেলেই ভয় হইয়া থাকে, পাছে পরীক্ষার পড়ার ক্ষতি হইল। কিন্তু বাস্তবিক মানসিক উন্নতির পক্ষে দুইই দরকারী। Class এর বই ছাড়া বেশী দুএকখানা বই পড়িলে মনোবৃত্তির যে বিকাশ হয়, তাহা কেবল পরীক্ষার ফলের জন্য কেন, সকল সময়েই কাজে লাগে। একই মন নানা উপকরণে গঠিত হইতেছে। তবে আর এ বই ও বই, কাজের বই আর বাজে বই বলিয়া তফাৎ করি কেন? কিন্তু পরীক্ষার নিয়ম যদি এত খারাপ হয়, যে মনোবৃত্তির বিকাশের বিচার না করিয়া মুখস্থ করার শক্তিরই পরিচয় লওয়া হয়, সেই অবস্থায় text-book পড়াই একমাত্র লাভজনক "paying study" বোধ হইবে; কিন্তু সুন্দররূপে পরীক্ষার প্রশ্ন করিলে নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে বয়সের উপযুক্ত যতটুকু বুদ্ধির

বিকাশ আশা করা যায়, সেই পরিমাণ বিচার করার সম্ভাবনা থাকে। এ নিয়মে text না পড়িয়াও, অথবা কিছু কম পড়িয়াও, বা পড়া না থাকিলেও নির্ভয়ে, পরীক্ষায় উত্তম ফল পাওয়ার আশা করা যাইতে পারে। কিন্তু অনেক স্থলে পরীক্ষা বুদ্ধির বিচার না করিয়া স্মরণ-শক্তির প্রমাণ গ্রহণ করে বলিয়া মন সঙ্কীর্ণ হইয়া যায়, বাঁধা পথ ছাড়া নূতন পথে চলিতে ভয় হয়।

অনেক সময় ছাত্রেরা যে বলিয়া থাকে "ঐ novelটা বা dramaটা পড়েছিলাম—কিন্তু examine দেবার মত করে পড়িনি" —তাতে বোঝা যায়—যে পরীক্ষার জন্য পড়া আর জ্ঞানের জন্য পড়ার উপায় দুটী পৃথক্। এটা ভুল,—পরীক্ষার জন্য পড়ার কোন বিশেষত্ব থাকা উচিত নয়। যখন যাই পড়ি না কেন, সবই প্রকৃত জ্ঞানলাভের জন্য; তবে ইহার কোনটীতে যদি পরীক্ষাই দিতে হয়, তাহার জন্য বিশেষ প্রস্তুত হইবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু পরীক্ষার নিয়ম অন্ততঃ এরূপ হওয়া চাই, যাহাতে জ্ঞানেরই বিচার করা হয়।

পরীক্ষায় কূটপ্রশ্ন না করা বা কোন না কোন উপায়ে ঠকাইবার মতলব না থাকা যেমন প্রকৃত বিদ্যাচর্চ্চার সহায় এবং স্বাধীন চিন্তার উদ্দীপক, তেমনি দুইখানা চারিখানা বাঁধা বই ঠিক না করিয়া দিয়া বিষয়েরই আলোচনার সাহায্য করাও মৌলিকতা এবং স্বাবলম্বনের প্রধান উপায়। অবশ্য এ নিয়মে শিক্ষকের পারদর্শিতা অত্যন্ত আবশ্যক। কখন কোন্ বইয়ের কোন্ অধ্যায় পড়া উচিত, কোন্ বিষয়ের পর এবং কোন্ বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গে কোন্ বিষয়

(৪)
গ্রন্থ নির্দ্দেশের পরিবর্ত্তে বিষয়ের আলোচনায় উৎসাহ প্রদান

আরম্ভ করা উচিত, এসব স্থির করিয়া শিক্ষক শিক্ষার্থীর যোগ্যতা ও বয়সানুসারে শিক্ষাদান করিলে তাহার বৃত্তিগুলি অতি স্বাভাবিক ও সহজভাবে প্রস্ফুটিত হয়, এবং মন বেশ কর্ম্মঠ ও চিন্তাশীল হয়।

ইহাতে ছাত্র বিষয়টা প্রস্তুত না পাইয়া নিজেই ধীরে ধীরে তৈয়ার করিয়া লইতেছে, এরূপ মনে হয়। এ উপায়ে জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে বিষয়ও যেন শিক্ষার্থীর সম্মুখে ক্রমে বিকশিত হইতে থাকে। এ নিয়মে মুখস্থ করার প্রবৃত্তি আদৌ হইতে পারে না; বরং ধী-শক্তির সঞ্চালন ভিন্ন এক ধাপও অগ্রসর না হওয়ায় মন অতি স্বাভাবিক ভাবে ও সহজে দৃঢ়তা প্রাপ্ত হয় এবং স্বাবলম্বন শিক্ষা করে। আর বই পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই বই কোন্ পদ্ধতিতে লিখিতে হয়, পুস্তক লিখিবার কৌশল, এবং কোন বিষয় আলোচনা করিবার শৃঙ্খলা, সমস্তই শিক্ষা হইয়া যায়। ইহাতে এক বিষয়ের সঙ্গে অপর বিষয়ের কি সম্বন্ধ অতি সহজেই স্থির করা যায়। পৃথিবীর সমস্ত পদার্থই যে পরস্পর সম্বন্ধ এবং সমস্ত বিজ্ঞানই যে অতি স্বাভাবিক ভাবে সংলগ্ন ইহা প্রমাণিত হইয়া পড়ে। ইতিহাসের সঙ্গে জড় বিজ্ঞানের, রাজনীতির সঙ্গে মনোবিজ্ঞানের নৈকট্য ও ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ নির্দ্ধারিত হয়। ব্যাপক ভাবে সমস্ত জিনিষ আলোচনা করিতে প্রবৃত্তি হয়, এবং তাহার সুবিধাও থাকে। তখন গণিত শিক্ষা না করিলেও চলে, কিংবা ইতিহাসে কেবল মারামারি কাটাকাটির কথাই থাকে, অথবা বর্ত্তমান কালে সংস্কৃত সাহিত্য শিক্ষার দরকার নাই এরূপ অসঙ্গত কথা বলিতে পারা যায় না। তাহা হইলে ছাত্রেরা স্বতই দেখিতে পারে যে

Burke এর French Revolution এ যে সত্য আছে, Political Economyতে এবং Psychologyতেও সে সত্যই আর একভাবে অন্য Context এ সন্নিবেশিত রহিয়াছে। তখন যে কয়টী বিষয় পড়া হইতেছে, তাহাদের মধ্যে কোন বিরোধ না দেখিয়া পরস্পর পরস্পরের সহায়তাই করে এরূপ বুঝিতে পারা যায়।

বাস্তবিক text-book system উঠাইয়া দিলে অথবা কিছু হ্রাস করিলে মনের যে চিন্তা শক্তির উদ্রেক হয় এবং যে স্বাবলম্বনের ইচ্ছা হয় তাহাতে কোন বিষয় এই বই এ পড়েছি বা ওই তথ্যটা অমুক বিজ্ঞানের অমুক অধ্যায়ে আছে মনে না হইয়া নিজের মনেরই অমুক স্থান অথবা মস্তিষ্কের অমুক প্রকোষ্ঠ অধিকার করিয়া আছে এবং অন্যান্য সত্যের সঙ্গে এই এই সম্বন্ধে গ্রথিত রহিয়াছে মনে হইবে। ইহাতে সমস্ত জ্ঞান এবং সকল প্রকার সত্যই নিজস্ব হইয়া যায়—পড়াবিদ্যা বা বইয়ের কথা বোধ হয় না। নিজের মনটাই এই বিশ্বের নব সমস্ত সত্যের মৌলিক ভাণ্ডাররূপে কাজ করে। স্বাধীন চিন্তাই এরূপ শিক্ষার প্রাণস্বরূপ।

অতএব চিন্তায় স্বাধীনতা ও মৌলিকতার উদ্রেক করাইতে হইলে শিক্ষার বিষয়ের প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগ জন্মান চাই। এই জন্য ছাত্রের উচিত বিদ্যাশিক্ষাকে অন্য কোন জিনিষের উপায় মনে না করিয়া তাহার নিজেরই জন্য আদর করা; এই উদ্দেশ্যে বিদ্যালয়ের এরূপ ব্যবস্থা করা চাই যাহাতে শিক্ষাই ভবিষ্যতে পরিবার-পালন এবং জীবিকা অর্জ্জন প্রভৃতি যাবতীয় কর্ত্তব্য সাধনের সুবিধা করিয়া দেয়; এবং পরীক্ষার ব্যবস্থা এরূপ হওয়া আবশ্যক, যাহাতে

ছাত্রগণ জ্ঞানের ও বিস্তারই পরিচয় দিতে পারে। আর নির্দ্দিষ্ট বই না পড়িয়া বিষয়ের আলোচনা করিলে প্রকৃত জ্ঞানের প্রতি চিত্ত আকৃষ্ট হয়। এজন্য দুইখানা চারিখানা পাঠ্যপুস্তক নির্দ্দিষ্ট করিয়া ছাত্রের হাত পা বাঁধিয়া না দিয়া, যে যে লেখকদিগের লেখায় আলোচ্য বিষয়টীকে নানা দিক্ হইতে বিচার করা হইয়াছে, তাঁহাদের পুস্তক-গুলি অনুমোদন মাত্র করাই সঙ্গত।

চরিত্রগঠনের উপাদান—মানবসেবা

আমাদের দেশের লোকেরা যে যে অবস্থায় আছে, প্রত্যেককে সেই অবস্থার উপযুক্ত সমাজহিতকর কাজ করিতে হইবে। কেবল অবিবাহিত, সন্ন্যাসী, ফকীর ও ভবঘুরের দলের দ্বারা সমস্ত কাজ সাধিত হইবার নয়। ছাত্র, বৃদ্ধ, যুবা সকলেরই এ সম্বন্ধে কর্ত্তব্য আছে।

"ছাত্রাণামধ্যয়নং তপঃ" বটে, কিন্তু ছাত্র ত কেবল এক আলমারি বই নয়! ছাত্রেরা কেবল ছেলে নয়, তাহারা মানুষ।

ছাত্র জীবনে পরোপকার

অতএব বাল্যকালের কর্ত্তব্যপালনের মধ্যে মনুষ্যোচিত কার্য্যও করিতে হইবে। কষ্ট এবং বিপদের মধ্যে থাকিয়াও স্বভাবকে অস্থির হইতে না দেওয়া,—নানা রকম লোকের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া নিজের খুঁটি না ছাড়া, পরোপকারী হওয়া, বুড়োদের মত ছাত্রদেরও কর্ত্তব্য।

আর ছাত্রজীবন ত চিরকাল থাকিবে না—অচিরেই প্রত্যেককে সংসারে প্রবিষ্ট হইয়া পরিবার, সমাজ ও দেশের গুরুভার বহন করিতে হইবে। সেজন্য ত ছাত্রাবস্থা হইতেই প্রস্তুত হওয়া প্রয়োজন। দেশসেবা যদি বৃদ্ধ বা প্রবীণদেরই কাজ হয়,—তাহার জন্যও ত শিক্ষা দরকার। তাই পঠদ্দশায় দশের কাজে মন দিলে অধ্যয়নের কোন ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা নাই। বরং ভবিষ্যৎ-

জীবনের জন্য প্রস্তুত হইয়া অল্প বয়স হইতেই স্বার্থত্যাগ করিতে অভ্যস্ত হইলে, সম্পূর্ণ মনুষত্ব বিকাশেরই সুবিধা পাওয়া যায়।

অনেকে যে বলেন বিবাহিত লোকদের দেশহিতৈষিতা পোষায় না, এ কথার যে মানে কি, তাঁহারাই বলিতে পারেন।

গৃহস্থের নিত্যকর্ম্ম পদ্ধতি

সংসারীদের ধর্ম্ম কি কেবল টাকাপয়সা রোজগার করা, আর পৃথিবীর লোকসংখ্যা বৃদ্ধি করা? নিজ ও নিজের পরিবারের ভাত কাপড় যোগান ত কর্ত্তব্যই। গরু ছাগলও এই ভাবের কাজ করিয়া থাকে। সন্তান সন্ততির মঙ্গলকামনা, পশুমানুষ, দুই জীবই করে। তবে মানুষের বিশেষত্ব থাকিল কোথায়? যে লোক পশুর সমান না হইয়া মানুষ হইতে চাহে, তাহার কর্ত্তব্য নিজের পরিবার পালনের সঙ্গে সঙ্গেই দেশের অন্যান্য লোকেরও যতদূর সম্ভব হিতসাধন করা। "নিজেদের পেটই চলে না, তা আবার পরোপকার," এরূপ ভাবিলে নরজীবন সার্থক হয় না। অতি সামান্য ধনাগম হইলেও, তাহারই কিয়দংশ পরের জন্য গচ্ছিত রাখা কর্ত্তব্য। মানুষের দৈনিক কাজের তালিকায় এবং দৈনিক খরচের হিসাবের খাতায়, পরের কাজে কিছু সময় দান ও পরের সাহায্যে কিছু অর্থদানের ব্যবস্থা থাকা বাঞ্ছনীয়। 'আগে পরিবার পালন করা যাক, তাহার পর যদি সময় থাকে ও কিছু বাঁচে দশের জন্য খরচ করা যাবে'—এরূপ ভাবিলে যত বড় ধনীই হউন না কেন, পরের জন্য কিছু বাঁচাইতে পারা যাইবে না। তাই সময়ের ও আয়ের কিয়দংশ পরের জন্য দিতেই হইবে ঠিক

করিয়া সংসারকর্ম্মে প্রবিষ্ট হওয়া দরকার। পারিবারিক জীবনের মত সামাজিক জীবনের জন্যও ব্যবস্থা করিতে প্রত্যেক মানুষই ধর্ম্মতঃ বাধ্য। সমাজ যখন সংসারীদেরই লইয়া গঠিত, তখন সমাজসেবা ত তাহাদেরই প্রধান কর্ত্তব্য। জ্বালা, যন্ত্রণা, অভাব, কষ্ট সংসারীদের সর্ব্বদা ভোগ করিতে হইলেও, এই অবস্থায়ই সমগ্র সমাজের ভবিষ্যৎ সুখস্বচ্ছন্দতার আশায় কিছু কিছু ত্যাগ-স্বীকার করিতে হইবে।

ফকীরদের আবার দেশবিদেশ কি? তাঁহারা—

"বিশ্বজগৎ আমারে মাগিলে কে মোর আত্মপর?
আমার বিধাতা আমাতে জাগিলে কোথায় আমার ঘর?"

—এই ভাবিয়া সর্ব্বত্র সমদর্শী ও "আস্‌মান্‌কা তল আর জমীন্‌কা উপর" নিজের ঘর মনে করিয়া থাকেন। তাঁহাদের কাছে জাতীয়তা—স্বদেশহিতৈষিতা ত আশা করাই উচিত নহে। তাঁহারা সমস্ত মনুষ্যজাতির কল্যাণের জন্য দিনরাত ভগবানের আরাধনায় নিমগ্ন। তাঁহারা নিম্নস্তরের এক ক্ষুদ্র গণ্ডী ছাড়িয়া অনেকদূরে অবস্থিত। তবে সমগ্র দেশের ও সমাজের সংস্কারসাধন না হইলে ধর্ম্মভাব লোপপাইবার সম্ভাবনা, এবং ক্রমশঃ মানুষ বিষয়ভোগাদির নীচচিন্তায় মন-প্রাণকে কলুষিত করিয়া সমস্ত উচ্চ আদর্শ বর্জ্জন করিতে পারে,—এই আশঙ্কায় অনেক সময়ে সন্ন্যাসাশ্রমের মহাত্মারা দেশের নৈতিক এবং বৈষয়িক আন্দোলনেও যোগদান করিয়া থাকেন এবং কার্য্য-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া উন্নতির সহায়তা করিতে পশ্চাৎপদ হন না।

সন্ন্যাসাশ্রম ও স্বদেশ

স্বদেশের সকল কার্য্যে যেমন সকল প্রকার ও সকল অবস্থার লোকেরই সমবেত চেষ্টা প্রয়োজন, তেমনই দেশের সর্ব্বত্র সকল স্থানেই সেই চেষ্টার কার্য্য হওয়া বাঞ্ছনীয়। বড় বড় সহরের কয়েক-জন ধনী বা শিক্ষিত লোকেরা সমাজের জন্য খাটিলে বা ভাবিলে বেশী ফল পাওয়া যাইবে না। প্রত্যেক জেলার প্রত্যেক গ্রামের পল্লী জীবনে নূতন নূতন প্রত্যেক লোকের মধ্যে আত্মপ্রতিষ্ঠার আশা ও আকাঙ্ক্ষা সঞ্চার উপায়ালোচনা প্রবেশ করাইতে হইবে। কেবল যেখানে অধিক লোকের সমাগম হয় বা ব্যবসাবাণিজ্যের কলকোলাহল খুব বেশী, যেখানে সরকার বাহাদুরের বিবিধ আফিস ও কর্ম্মকেন্দ্র লোকবৃন্দকে সর্ব্বদা সতর্ক করিয়া রাখিয়াছে, কেবল সেই সকল জায়গায় শিক্ষার আন্দোলন বা শিল্প শিক্ষার ব্যবস্থা বা বিজ্ঞানচর্চ্চা বা রাজনৈতিক শিক্ষা হইলে দেশের প্রায় সমস্ত লোকই এ সব বিষয়ে একান্ত অজ্ঞ থাকিয়া যাইবে। যেখানে অতি নিস্তব্ধ বৃক্ষচ্ছায়ায় বসিয়া গরুবাছুরদের সঙ্গে নিরীহস্বভাব লোকেরা শ্রমবিনোদন করিতেছে,যেখানে সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কোন সময়ই কোন চিন্তার ও উদ্বেগের কারণ হয় না, সকলেই শান্তির সহিত নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম সমাধা করিতেছে, যেখানে সভ্যতার বাহ্যাড়ম্বর এখনো বেশী প্রবেশ করে নাই, যেখানে হিন্দু মুসলমান একমন একপ্রাণ হইয়া পাড়ার সমস্ত কাজই করিয়া থাকে, যেখানে সামাজিক উচ্ছৃঙ্খলতা এখনো প্রবিষ্ট হয় নাই, সমস্ত লোকই পূর্ব্বপুরুষদের চিরন্তন প্রথা প্রত্যেক সামাজিক ও পারি-বারিক কাজেই বজায় রাখিবার জন্য যত্নবান্, যেখানকার আম-

কাঁঠাল বনের দেবমন্দির হইতে ভক্তি ও শ্রদ্ধা এখনও অপসৃত হয় নাই, সেই সুখের নীড়, শান্তির আধার, আমাদের পল্লীসমাজে নূতন নূতন কথা শুনাইয়া তাহাদের মনে এক অভিনব ভাব ঢালিয়া তাহাদিগকে ব্যাকুল করিয়া তুলিতে হইবে। তাহাদের শান্তিময় কুটীরাবাসে উন্নতির আকাঙ্ক্ষা, কষ্টভোগ ও কার্য্য করিবার বাসনা প্রবেশ করাইতে হইবে। সামাজিক ও অপরাপর সকল আন্দোলন দ্বারা তাহাদের চিত্তের বিক্ষোভ জন্মাইতে হইবে। তাহাদিগকে শিখাইতে হইবে, দেশের কোথায় কোন্ চিন্তা, কোন্ কাজ হইতেছে। সকলের সঙ্গে সংযোগ রাখিয়া এই আধুনিক পৃথিবীর নূতন অবস্থার উপযুক্ত করিয়া গ্রাম্যজীবনকে সঞ্জীবিত করিতে হইবে। গ্রামের সঙ্গে সহরের যে বিরোধ কিছুকাল হইল ঘটিয়াছে এবং এজন্য পল্লীতে যে যে দোষ প্রবেশ করিয়াছে, সমস্তই প্রতীকার করিবার জন্য ঘরে ঘরে হিন্দু-মুসলমান, কৈবর্ত্ত ব্রাহ্মণ, জোলা তাঁতী সকলকে শিক্ষাদান করিয়া স্বীয় অধিকারস্থাপনের চেষ্টা করিতে উপদেশ দিতে হইবে।

সমাজ সেবার বিবিধ সাধন

এই নানা জায়গায় নানা লোকের এককালীন কাজ করিবার আমাদের দেশে এখনও ভালরকম বন্দোবস্ত হয় নাই। সকল কাজই যেন খাপছাড়া বা পরস্পর বিরোধী। দেশের সমস্ত লোককে সম্মিলিত করিবার চেষ্টা এখনো করা হয় নাই। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মনের ভাব প্রত্যেককে জানাইবার জন্য সকলের মধ্যে আনাগোনা করিবার সুবিধা করিতে হইবে। পূর্ব্বকালে রেলগাড়ী টেলিগ্রাম, ডাকঘর,

যখন ছিল না, তখন যেমন তীর্থযাত্রী, সন্ন্যাসী, ফকীর বা ব্যবসায়ীরা আমাদের দেশে ভাবের আদান প্রদান করিতেন এবং ঐ উপায়ে অতিদূর দেশের সংবাদ ও আচার ব্যবহার জানা যাইত, এখনকার রেলগাড়ী ও খবরের কাগজের দিনেও সেই রকম, "স্বদেশী" ছাঁচের চিন্তার আদানপ্রদান করা বাঞ্ছনীয়।

এজন্য জেলায় জেলায় সমাজনীতিপ্রচারকের দরকার। তাঁহারা সহরের চিন্তা ও কাজের তালিকা পল্লীতে লইয়া গিয়া তাহাদের শিক্ষকতার কাজ করিবেন এবং পল্লীর অবস্থা সহরকে শুনাইয়া

প্রচারক ও আচার্য্য

নূতন fact, নূতন আলোচ্য বিষয় ও অভিনব সমস্যা প্রদান করিয়া উপযুক্ত লোকদের কাজে সহায়তা করিবেন। তাঁহারা সাময়িক পত্রিকার লেখাকে নিজেদের প্রাণের কথার সঙ্গে, হৃদয়ের আবেগের ও স্বভাবের দৃঢ়তার সহিত সামঞ্জস্য বিধান দ্বারা সজীব করিয়া তুলিবেন। প্রচলিত পত্রিকাসমূহ এ উপায়ে কেবল বইএপড়া জিনিষ বা দায়িত্বহীন মাথাপাগলা লোকের বিকারবচন না হইয়া এক মহাসত্যরূপে সকলের মনে স্থান পাইবে। আর ইহাতে পাড়ার সঙ্গে পাড়ার, সহরের সঙ্গে গ্রামের, মুসলমানের সঙ্গে হিন্দুর সহানুভূতি ও একপ্রাণতা বর্দ্ধিত হইয়া সমস্ত দেশ ও সমাজকে একীকৃত করিবে। তাহাতে কাহার কি কর্ত্তব্য, কোন্ সামাজিক organএর কোন্ function, কোথায়, কোন্ বস্তুর অভাব, অতি স্বাভাবিক নিয়মেই স্থির হইয়া যাইবে। তাই সংবাদপত্র যদি উঠিয়া যায়, তাহাতে কোন ভয়ের বা দুঃখের কারণ নাই। এই পর্য্যটকেরাই আরও সুন্দর

এবং হৃদয়গ্রাহিভাবে দেশের লোককে শিক্ষাদান করিয়া ঘরে ঘরে আন্দোলন লইয়া গিয়া সমস্ত জাতির হৃদয়ে নবশক্তি সঞ্চার করিবেন। এ কাজ সকলের পক্ষেই সম্ভব—সন্ন্যাসী, সংসারী, ছাত্র-যুবা, বিবাহিত, অবিবাহিত, প্রত্যেকে এ কাজ অনায়াসেই করিতে পারেন। আর ইহাতে হৈ চৈ নাই, স্থিরভাবেই সকলের কর্ত্তব্য উপদেশ দেওয়া যাইতে পারিবে।

আলোচনা ও লোকশিক্ষা

আর সর্ব্বত্রই সভাসমিতি হওয়া বাঞ্ছনীয়। কাজ করিতে হইবে বটে, কিন্তু তাহা বলিয়া বক্তৃতা বা লোককে বুঝাইবার জন্য কোন উপায় অবলম্বন একেবারে ছাড়িয়া দিলে চলিবে না। দেশের সমস্ত লোকই যদি কোনদিন 'কেজো' হইয়া উঠেন, তবুও মিটিং করিবার দরকার থাকিবে। গ্রামে গ্রামে, পাড়ায় পাড়ায় দেশের বিচিত্র কথা বলিয়া বেড়াইবার ও পরহিতব্রতে সকলকে দীক্ষিত করিবার সুযোগ সৃষ্টি করিতে হইবে। বড় বড় সভাসমিতি বন্ধ হইয়া যাইতে পারে বটে, কিন্তু ঘরে ঘরে অসংখ্য সভাসমিতি ও সমাজের অবস্থা আলোচনা করিবার বন্দোবস্ত হইবে। ইহাতে বাক্যব্যয় কম হইলেও কাজ বেশীই হইবে।

তাই অনেকে বলেন যে, meetingএ কেবল হৈ চৈ হয়, কাজ কিছুই হয় না, এ কথা বিশ্বাস করা যায় না। তাঁহাদের অধিকাংশগুলেই দশের জন্য কোন কিছু করিতেই অপ্রবৃত্তি, এবং নিজের ছেলেদের স্বাবলম্বন শিক্ষা দিতে অনিচ্ছা। এই যে Congressটা কেবল তিন দিনের জন্য পয়সাওয়ালা উকীল ব্যারি-

ষ্টারদের আমোদ প্রমোদ বা বিশ্রম্ভালাপের এক আড্ডা বলিয়া সর্ব্বদা তিরস্কার করা হয়, এই তিন দিনের meeting হইতেই, আর কিছু কাজ হউক্ বা নাই হউক্, আমাদের যথেষ্ট শিক্ষা হইয়াছে, আমাদের অনেক উপকার হইয়াছে, আমরা আমাদিগকে চিনিবার উপযুক্ত অবসর পাইয়াছি, আমাদের কোথায় কে কি ভাবেন, কে কি করেন, কোন্ ব্যক্তির কত সাহস, কত কার্য্যনৈপুণ্য, সব বুঝিতে সুযোগ পাওয়া গিয়াছে। এই মহাদেশের কাজটাকে সকলেরই নিজের কাজ বলিয়া বুঝিতে পারা যাইতেছে। আমরা একটা Indian Public opinion তৈয়ারী করিতে সমর্থ হইতেছি, দেশের সমস্ত কাজেই এই প্রকাণ্ড দেশের জন-সাধারণ এক মত বা এক অমত প্রকাশ করিতে পারিতেছে। আর এ উপায়ে সমবেত চেষ্টায় কার্য্য করিবার উপায় পরিষ্কার হইয়া আসিয়াছে। আজ কাল যে জেলাসমিতি হইতেছে, তাহাতে, বাজে কাজ, নিরর্থক বক্তৃতা অনেক হইলেও, সহরে পল্লীতে সংযোগ দৃঢ় হইতেছে, হৃদয়ে হৃদয়ের বাঁধন শক্ত হইতেছে। এই সকল আন্দোলনের ফল কিছুই হয় নাই, এমন বলা যায় না। আধুনিক সময়ে কর্ত্তৃপক্ষেরা ও আমাদের কথায় কর্ণপাত করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন।

অবশ্য কেবল বক্তৃতা বা সভায় কাজ অগ্রসর হইবে না। তাহার জন্য দেশের সর্ব্বত্র, নানা রকমের, নানা উদ্দেশ্যে কেন্দ্র চাই, যাহাদ্বারা বক্তৃতার বা বইএর উপদেশ হাওয়ায় উড়িয়া না গিয়া কাজের ভিতর দিয়া অনুষ্ঠানের মধ্যে ধরিয়া রাখা যায়। কোথায়

বা শিল্পোন্নতির জন্য, কোথাও বা সাধারণ লোকশিক্ষার জন্য, কোথাও বা সমাজসংস্কারের জন্য, কোথায় বা ধর্ম্মচর্চ্চার জন্য। এরূপ ছোট বড় অনেক দল বাঁধা চাই, এসব দলে সকলে মিলিয়া মিশিয়া কাজ করিতে অভ্যস্ত হইয়া একই উদ্দেশ্যে জীবন গঠন করিতে শিখে,—ইহাতে স্বাধীন চিন্তা ও স্বাধীন কর্ম্মের ক্ষেত্র পাইয়া নিজের নৈতিক ও মানসিক বৃত্তি বিকাশের সুযোগ পায়। এসব স্থানে প্রধান শিক্ষা এই হয় যে, দলের বা সমিতির প্রত্যেক লোকেরই ইহার কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্যই আছে তাহা নহে, তিনি সর্ব্ব বিষয়ে আলোচনা ও বিচার করিবারও অধিকারী।

আরোহপদ্ধতির অধ্যাপনাপ্রণালী

এতদিন আমাদের দেশে যে ভাবে ভাষা, দর্শন, ইতিহাস, বিজ্ঞান, শিল্প প্রভৃতি গণিত, বিষয়ে অধ্যাপনাকার্য্য চলিতেছিল, তাহার যথোচিত পরিবর্ত্তন করিয়া উন্নত শিক্ষা-প্রণালীর অবতারণা করিতেই হইবে। এক কথায় বলিতে হইলে, যে প্রণালীতে শিক্ষার্থী শারীরিক ও মানসিক ক্রমবিকাশের সঙ্গেসঙ্গে শিক্ষা লাভ করিয়া পরিচিত সত্য হইতে ক্রমশঃ অপরিচিত ও অজ্ঞাত সত্যে উপনীত হইতে পারে; বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই সত্য আবিষ্কারের পন্থা হৃদয়ঙ্গম, এবং নিজের উদ্ভাবনী শক্তি ও বুদ্ধিস্বাতন্ত্র্যের পরিচয় পাইয়া স্বকীয় সৃষ্টি ও মৌলিক চিন্তার আনন্দ উপভোগ করিতে পারে; এবং যে প্রণালীতে আলোচ্য ও শিক্ষণীয় বিষয়ের ক্রম-বিকাশ শিক্ষার্থীর স্বকীয় ক্রমবিকাশের অনুরূপ হইতে পারে, এরূপ শিক্ষাপ্রণালীর প্রবর্ত্তন করা আবশ্যক।

নূতন প্রণালীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় (১) আবিষ্কার (২) আরোহণ

বৈজ্ঞানিকেরা এবং নানাবিধ সত্যের আবিষ্কারকেরা ভ্রম সংশোধন করিতে করিতে অনেক অসম্পূর্ণ ও আংশিক সত্য এবং অসত্যের দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়া, ধীরে ধীরে দুএকটী খণ্ড সত্য সংগ্রহের পর শেষে সম্পূর্ণ সত্যের দুর্গ করতলগত করিয়া থাকেন। ছাত্রকেও ঠিক সেই ভাবে আবিষ্কার করিতে করিতে, অজানা পথের ভিতর দিয়া, অনেক ব্যর্থ প্রয়াসের পর সত্য লাভ করিতে চেষ্টা করিতে হইবে। অপর লোকেরা যে সকল সত্যের উপলব্ধি করিয়াছেন এবং সেই সত্যসমূহ অবলম্বন করিয়া যে

আবিষ্কারকের জীবন ও কার্য্যপ্রণালী অনুকরণীয়

সকল পুস্তক রচনা করিয়াছেন, ছাত্রকে সেই সকল সত্য স্বীকার করাইয়া দেওয়ান এবং পুস্তক সকল আবৃত্তি করান শিক্ষকের কর্ত্তব্য নহে। তাঁহাকে কেবলমাত্র ছাত্রের পথ প্রদর্শকের ন্যায় থাকিয়া তাহার সত্য আবিষ্কারের প্রয়াসে সহায় হইতে হইবে।

শিক্ষক শিক্ষার্থীর আবিষ্কার ব্যাপারে পথপ্রদর্শক মাত্র

তবে শিক্ষার্থী ছাত্র এবং প্রথম আবিষ্কারকের মধ্যে এই প্রভেদ যে, প্রকৃত আবিষ্কারককে অসহায় ভাবে পৃথিবীর আদিম অবস্থায় একাকী পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল, অন্ধকারে চলিতে যাইয়া অনেক ব্যর্থ চেষ্টা করিতে হইয়াছিল। এ জন্য বহুব্যক্তির জীবনব্যাপী, নিঃস্বার্থ ও ফললাভে নিরাকাঙ্ক্ষ কর্ম্মের ফলে এক একটী সত্য আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং এই কারণে বহুজীবন নিরর্থক ব্যয়িত হইয়াছে। কিন্তু ছাত্রকে এরূপ ব্যর্থযত্ন হইতে হইবে না। বহু জাতি ও বহু ব্যক্তির প্রয়াসপ্রসূত জড়জগৎ ও চিজ্জগতের সত্য সমূহ তাহার নিকট বিজ্ঞানাকারে সঞ্চিত ও পুঞ্জীকৃত রহিয়াছে। তাহার শিক্ষক এই ভাণ্ডারের অধিকারী হইয়া সর্ব্ব-বিত্তারক্ষক ভাবে সর্ব্বদা তাহার সহায়তা করিতেছেন। যে যে পন্থা অবলম্বন করিয়া বৈজ্ঞানিকেরা সত্য সকল উদ্ভাবন করিয়াছেন, সেই সকল উপায় এখন শিক্ষার্থীকে নূতন করিয়া উদ্ভাবন করিতে হইবে না। তাহার শিক্ষকের মনেই সেই প্রণালী গুলি সর্ব্বদা রহিয়াছে, সুতরাং বহুযুগে পৃথিবী যাহা লাভ করিয়াছে, ছাত্র এক জীবনেই এখন তাহা লাভ করিতে সমর্থ। ছাত্রের জীবন কোন কোন সুপণ্ডিতের জীবনের ন্যায় নিরর্থক হইবার সম্ভাবনা নাই।

শিক্ষার্থী আবিষ্কারক, কেবলমাত্র পাঠক নহে। গ্রন্থকার যে ভাবে নিজ নিজ পুস্তক রচনা করিয়া তথ্যনির্ব্বাচন করেন, শিক্ষার্থীকে ঠিক সেই ভাবে পুস্তক পাঠ অথবা বিষয়ের আলোচনা করিতে হইবে না। সাধারণতঃ যে প্রণালীতে পুস্তক রচিত হইয়া থাকে, তাহাতে গ্রন্থকর্ত্তার প্রয়াস-সমূহের বিবরণ থাকে না,—তিনি বহু গবেষণা করিয়া যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, সেই সিদ্ধান্তগুলি অন্যান্য ব্যক্তির সিদ্ধান্তসমূহের সহিত মিলাইয়া এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া তাঁহার পুস্তকে সন্নিবিষ্ট করেন। ইহাতে পুস্তকের শ্রীবৃদ্ধি এবং গৌরব সাধিত হয় বটে, কিন্তু শিক্ষার্থী সিদ্ধান্তগুলি পাইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না,—তাহার পক্ষে ফললাভ অপেক্ষা ফল লাভের উপায় অধিক আবশ্যক। এজন্য অতি সুপণ্ডিতরচিত পুস্তকও শিক্ষার প্রথমস্তরে শিক্ষার্থীর উপযোগী নহে।

শিক্ষা পদ্ধতিতে গ্রন্থ-পাঠের স্থান

বিবিধ কারণে গ্রন্থসমূহের সারমর্ম্ম, রচনাকৌশল এবং লিখন-পদ্ধতির সহিত ছাত্রের পরিচিত হওয়া উচিত। কিন্তু কোন বিষয়ে ব্যুৎপন্ন হইবার জন্য ছাত্রকে যদি পুস্তক পাঠ করিতেই হয়—তাহা হইলে ছাত্রদিগের জন্য বিশেষ ভাবে পুস্তক রচনা করা উচিত। যে সকল পুস্তক দ্বারা ছাত্র স্বকীয় উন্নতি অনুসারে স্বাধীন ভাবে ক্রমশঃ কঠিনতর ও জটিলতর প্রশ্নের মীমাংসা করিতে বাধ্য হয়, যে সকল পুস্তকে সঙ্কেতমাত্র নির্দ্দিষ্ট হয়, উপায় ও পন্থা মাত্র বলিয়া দেওয়া হয়, এবং সকল কার্য্যই শিক্ষার্থীকে নিজদায়িত্ব গ্রহণ করিয়া সমাধা করিতে হয়, সেই সকল পুস্তকই শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে ছাত্রদিগের পাঠ করা উচিত।

আবিষ্কারকের প্রণালীতে শিক্ষালাভ করিলে স্বাধীন চিন্তা, স্বাধীন চেষ্টা, মৌলিকতা ও অনুসন্ধিৎসা স্বভাবসিদ্ধ হইয়া পড়ে।

স্বাধীনচিন্তা বিকাশের সুযোগ

এই উপায়ে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া মস্তিষ্কের সঞ্চালন করিলে মানসিক শক্তির বিকাশ ও পুষ্টি সাধিত হয়। অনুশীলনই শক্তির উপায়—কষ্ট ও সমস্যার ভিতর থাকিয়া ক্রমশঃ বিকাশ লাভ করিলেই শক্তি সঞ্চিত হইতে পারে। এজন্য অপরের আবিষ্কৃত সত্যের দ্বারা মস্তিষ্কের প্রকোষ্ঠগুলি পূর্ণ না করিয়া নিজে বিচার্য্য বিষয়গুলির জটিলতা ও দুরূহতা সরল করিবার চেষ্টা করাই প্রকৃষ্ট পন্থা।

সত্য আবিষ্কার করিবার যে যে উপায় আছে, তাহার মধ্যে যাহা দ্বারা শিক্ষার্থীকে বহুবিধ বিশেষ বিশেষ তথ্য ও ঘটনা

পৃথিবীর বৈচিত্র্য ও বিভিন্নতার পর্য্যা-লোচনা

আলোচনা করিতে হয়—সেই প্রণালীতে শিক্ষালাভ করিতে হইবে। এইরূপ বিশেষ বিশেষ আলোচনার পর তথ্যসমূহের অনৈক্য ও পার্থক্যের মধ্যে ঐক্য ও সামঞ্জস্য অন্বেষণ করিতে হইবে। এই আলোচনা-প্রণালীকে “ইণ্ডাকৃটিভ্” বা “আরোহ” পদ্ধতি বলে। ইহাতে জ্ঞান একটী প্রকৃত স্থির ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ও পুষ্ট হইয়া প্রসার লাভ করিতে পারে। কারণ এই প্রণালীতে শিক্ষার্থী সর্ব্বদা স্বাধীনভাবে চিন্তা করিয়া মস্তিষ্ক সঞ্চালন করিতে বাধ্য হয়, এবং বহু তথ্যের আলোচনায় রত থাকিয়া অনুসন্ধিৎসু ও নবতথ্যের আবিষ্কারক হইবার সুযোগ প্রাপ্ত হয়।

এই প্রণালীতে শিক্ষালাভ করিতে হইলে শিক্ষার্থীকে জানা

জিনিষের উপর অধিক মনোযোগ দিতে হইবে। অজানা বিষয়সমূহ একেবারে শিক্ষকের নিকট শুনিয়া আবৃত্তি করিতে হইবে না। ইহাতে বস্তুপরিচয় ও পদার্থবিচারের প্রাধান্য থাকিবে। অনেকগুলি বিশেষ বিশেষ আলোচনার পরে সূত্রসমূহ এবং সাধারণ নিয়ম সকল তাহাকে আয়ত্ত করিতে হইবে। সমীপস্থ, পরিচিত এবং বর্ত্তমান তথ্য ও পদার্থসমূহ নিরীক্ষণ করিতে করিতে জ্ঞানের বৃদ্ধির সহিত কল্পনাশক্তির প্রয়োগ করিয়া ক্রমশঃ দূরস্থ, অপরিচিত, অতীত এবং ভবিষ্যৎ ভাব ও পদার্থসমূহের ধারণা করিতে হইবে। স্থূলতর সত্যসমূহের আলোচনা হইতে ক্রমশঃ সূক্ষ্মতর সত্যের উদ্দেশ্যে উন্নীত হইতে হইবে।

পরিচিত বিষয়ের সমাহার ও ঘনিষ্ঠতা

সাহিত্যসংক্রান্ত বিদ্যাসমূহ এই প্রণালীতে আলোচিত হইলে ইহাদের মূলীভূত উপাদানগুলির প্রতি শিক্ষার্থীর দৃষ্টি বিশেষভাবে স্বতই আকৃষ্ট হইবে। প্রত্যেক আলোচ্য বিষয়ের মৌলিক সত্যগুলি আয়ত্ত হইতে হইতে তদ্বিষয়ে মনোবৃত্তিনিচয়ের সম্যক্ অনুশীলন হইবে এবং প্রকৃত সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক ও দার্শনিক শক্তিসমূহের বিকাশ সাধিত হইবে। এই প্রণালীতে অধ্যাপনাকার্য্য চলিলে গণিত এবং প্রাকৃতিক বিজ্ঞানসমূহেরও যথার্থ জ্ঞান লাভ হয় এবং গণিতজ্ঞ ও অনুসন্ধিৎসু হইবার সুযোগ পাওয়া যায়। যে সকল বৃত্তিসঞ্চালনে গণিতশাস্ত্রে অধিকার জন্মে, এবং স্বাভাবিক নিয়মগুলি অনুসন্ধান করিবার প্রবৃত্তি জাগরিত হয়, এই "আরোহ পদ্ধতি"র আবিষ্কার-প্রণালীতে সেই সকল বৃত্তি ও প্রবৃত্তির কার্য্য হইয়া থাকে।

বিবিধ শাস্ত্রের বিষয়ীভূত সত্যগুলি আলোচনা করিবার পন্থা নির্দ্দেশ

মানববিষয়ক বিজ্ঞানসমূহের শিক্ষালাভ করিতে হইলে ভিন্ন ভিন্ন চিন্তাপ্রণালী ও ভাবসমূহ, কর্ম্ম ও চরিত্রের আদর্শসমূহ, বিচিত্র রীতিনীতিসমূহ, অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান-সমূহের আলোচনা করিয়া মানবের মনোজগৎ, সামাজিক জগৎ, রাষ্ট্রীয় জগৎ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়াক্ষেত্রের বৈচিত্র্যের সহিত পরিচিত হওয়া উচিত। তেমনই প্রাকৃতিক ও জড় বিজ্ঞানসমূহের শিক্ষালাভ করিতে হইলে প্রকৃতি ও জড় জগতের বিভিন্ন শক্তিপুঞ্জ ও পদার্থ সমূহের সহিত পরিচিত হইয়া বাহ্য জগতের বিশালতা ও বৈচিত্র্য সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান লাভ করিতে হইবে। অনলে ভূতলে, পর্ব্বতে জলে, ঋতু পরিবর্ত্তনে, লতায় পাতায়, জীব জন্তুতে যে যে শক্তির ক্রিয়া হইতেছে, এই সকলের ফলে জগতের যত প্রকার পরিবর্ত্তন ও বিপ্লব উপস্থিত হইতেছে, এবং এই সমুদয় ব্যবহার করিয়া মানব যত প্রকার সুখ ভোগ করিতেছে, সেই সকল বিভিন্ন পদার্থ ও বিভিন্ন শক্তিসমূহের বিবরণ সংগ্রহ করিতে হইবে।

মানবীয় জগতের পরিচয় লাভ

এইরূপে বৈচিত্র্যময় প্রাকৃতিক জগতের নিত্যনব বিশেষ বিশেষ ঘটনাবলীর প্রতি মনোনিবেশ করিয়াই বাহ্যবস্তু সমূহের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে হইবে। চক্ষুঃ কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা এই সকল পদার্থের যথার্থজ্ঞান লাভ করিতে হইবে, ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়ের সহিত ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর প্রকৃত সংযোগ বিধান করিতে হইবে। এই উপায়ে পৃথিবীকে বিশেষরূপে চিনিয়া ইহার সহিত কুটুম্বিতা

বাহ্যজগতের সহিত আত্মীয়তা

স্থাপন করিতে হইবে। তাহা হইলে ইহার বিভিন্ন অভ্যাস ও ভাবগতিক সমূহ পরিষ্কার ভাবে হৃদয়ঙ্গম করা যাইতে পারিবে; প্রকৃতি ও জড় জগতের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, হাব ভাব, কার্য্য-প্রণালী ও প্রকাশের লক্ষণসমূহ অবগত হওয়া যাইবে; এবং প্রকৃতিকে প্রশ্ন করিয়া ইহার ভিতরকার কথাগুলি, অন্তর্নিহিত সত্যগুলি সহজে উদ্ধৃত করিতে পারা যাইবে।

শিল্প ও ব্যবসায় জগতের বিচিত্র কর্ম্ম কাণ্ড সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা

সাহিত্যিক বিষয়ে শিক্ষালাভ করিতে হইলে শিক্ষার্থীকে যেমন নৈতিক ও মানসিক জগতের বিচিত্র সমস্যা সমূহের সম্মুখীন হইতে হয়, বৈজ্ঞানিক বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিবার জন্য যেমন বাহ্যেন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রাকৃতিক জগতের বিচিত্র ঘটনাবলী অবলোকন করিতে হয়, তেমনই আবিষ্কারের আরোহপদ্ধতির প্রণালীতে ব্যবহারিক শিল্পশিক্ষা করিতে হইলে জগতের যাবতীয় ব্যবহার্য্য পদার্থ প্রস্তুত করিবার প্রণালীর তথ্য সংগ্রহ করিতে হইবে। বিজ্ঞানাগার ও ল্যাবরেটরীতে কার্য্য করা এবং প্রকৃতিকে নিরীক্ষণ করা যেমন প্রাকৃতিক বিজ্ঞান শিক্ষার প্রধান পন্থা, মানবের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবন নিরীক্ষণ করা যেমন মনোবিজ্ঞান শিক্ষালাভের উৎকৃষ্ট উপায়, তেমনি 'ওয়ার্কসপ্' ও কারখানায় বস্তু বিচার করা, দ্রব্য নির্ম্মাণে সহায়তা করা ও বিভিন্ন প্রণালী অবলোকন করাই শিল্পশিক্ষার প্রধান উপায়। এই জন্য পুস্তক ব্যবহার অথবা সূত্র মুখস্থ না করিয়া কারখানাকেই পুস্তক, শিক্ষালয় ও শিক্ষকরূপে বিবেচনা করিতে হইবে।

শিক্ষার্থীরা কোনও বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিবার জন্য সাধারণতঃ সূত্র ও formula গুলি পুস্তক হইতে আবৃত্তি করে এবং দৃষ্টান্ত বা প্রয়োগ স্বরূপ কয়েকটি "Experiment" করিয়া থাকে। এই নূতন প্রণালীতে পুস্তক, সূত্র ও নিয়মসমূহের স্থান গৌণ; 'ল্যাবরেটরী' বিজ্ঞানাগার ও কারখানার স্থানই মুখ্য। পুস্তকের সূত্র ল্যাবরেটরীতে আসিয়া মিলিয়াই লইতে হইবে না। ল্যাবরেটরী প্রভৃতিতে কর্ম্ম করিয়া যে তথ্যে উপনীত হওয়া যায়, তাহাই প্রকৃত সত্য বিবেচনা করিয়া ইহার সহিত পুস্তকাদির তথ্য তুলনা করিতে হইবে।

এইরূপ প্রণালীতে শিক্ষা প্রদান করিতে হইলে বহু প্রকারের এবং নানাশ্রেণীর ভাব ও পদার্থ, চিন্তা ও কর্ম্ম, ঘটনা ও পরিবর্ত্তন, শিক্ষার্থীর সম্মুখে আনয়ন করিতে হইবে। প্রত্যেকটিকে বহুদিক্ হইতে বিবিধ উপায়ে বিভিন্ন রকমের পরীক্ষা করিয়া নানারূপ তথ্য সংগ্রহ করিতে হইবে। এই রূপে বহুতথ্য সংগৃহীত হইলে প্রত্যেক বিষয়ের সামান্য ধর্ম্ম সকল, শ্রেণী সমূহ, নিয়মানুবর্ত্তিতা, সাধারণ ক্রিয়াপ্রণালী, কার্য্যকারণ-সম্বন্ধ এবং পারম্পর্য্যসমূহের ইঙ্গিত পাওয়া যাইবে। এই ইঙ্গিতগুলি শৃঙ্খলাবদ্ধরূপে ব্যবহার করিতে পারিলে প্রকৃত বৈজ্ঞানিক-সত্যের ধারণা জন্মিবে, বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য ও সামঞ্জস্য প্রতীয়মান হইবে এবং ক্রমশঃ সত্যগুলির মধ্যে অঙ্গাঙ্গিসম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হইয়া বিজ্ঞান-প্রতিষ্ঠার সহায়তা করিবে।

সামান্য ধর্ম্ম ও সাধারণ নিয়মগুলি স্বীকার্য্য নহে,—প্রতিপাদ্য

জাতীয় শিক্ষা কাহাকে বলে ?

কয়েক বৎসর হইতে বাঙ্গালা দেশের স্থানে স্থানে "বঙ্গদেশস্থ জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের" প্রবর্ত্তিত নূতন শিক্ষাপদ্ধতি অনুসারে জাতীয় শিক্ষা সম্বন্ধে শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা হইয়াছে। কিন্তু আংশিক ও দায়িত্বহীন জাতীয় শিক্ষার প্রকৃতি ও বিশেষত্ব সম্বন্ধে মতামত দেশের মধ্যে বিশেষ কোন আলোচনা হয় নাই। এজন্য এতৎ সম্বন্ধে যাঁহার যেরূপ অভিরুচি, তিনি সেইরূপ ধারণাই পোষণ করিয়া আসিতেছেন। যাঁহারা কেবলমাত্র দুএকটী ছাত্র বা শিক্ষক অথবা দুই একটা জাতীয় শিক্ষালয়ের পরিচয় পাইবার সুযোগ পাইয়াছেন, এবং কোন ব্যক্তিবিশেষের মতের অথবা কার্য্যের উপর নির্ভর করিয়াই জাতীয় শিক্ষার লক্ষণ নির্ণয় করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে অনেক ভ্রমে পতিত হইতে হইয়াছে।

অনেকে জাতীয় শিক্ষার নামমাত্র শুনিয়া ভাবিয়া রাখিয়াছেন—হিন্দুধর্ম্মশিক্ষা এবং সংস্কৃত-চর্চ্চার জন্যই জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এখানে ইংরাজী শিক্ষার কোন বন্দোবস্ত নাই এবং অন্য ধর্ম্মাবলম্বী ছাত্রের কোন স্থান নাই। ইহা এক প্রকার টোলবিশেষ।

অনেকে মনে করেন, কেবলমাত্র কারখানার কার্য্য শিক্ষা দেওয়াই জাতীয় শিক্ষার উদ্দেশ্য। ইহাতে সাহিত্য, ইতিহাস প্রভৃতি সাধারণ উচ্চ শিক্ষার কোন ব্যবস্থা নাই। সূত্রধর ও

কর্ম্মকারের কর্ম্ম এবং বয়নকার্য্য প্রভৃতি বিবিধ শিল্পশিক্ষার দ্বারা অন্ন সংস্থানের সুবিধার জন্যই জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সুতরাং যে সকল ছাত্র মেধাবী এবং যাহারা উন্নত উপায়ে জীবিকা অর্জ্জন করিতে সমর্থ, তাহারা এই বিদ্যালয়ে প্রবেশ করে না। সাধারণ শিক্ষা দ্বারা উপকার লাভের আশা যাহাদের অতি অল্প এবং যাহাদিগকে অতি বাল্যকালেই কোন একটী জীবিকার্জ্জনের পন্থা অবলম্বন করিতে হইবে, তাহাদের জন্যই জাতীয় শিক্ষার আয়োজন হইয়াছে।

আবার অনেকে ঠিক বিপরীত ধারণা পোষণ করিয়া থাকেন। তাঁহারা মনে করেন—কেবলমাত্র ধনবান্ ও অভাবহীন ব্যক্তি-দিগের সন্তানেরাই জাতীয় বিদ্যালয়ে প্রবেশ করে। জাতীয় বিদ্যালয়ে যে শিক্ষা প্রদান করা হয়, তাহাতে আর্থিক লাভের তেমন কোন প্রত্যাশা নাই। যাহারা কেবলমাত্র বিদ্যাচর্চ্চার জন্যই বিদ্যালাভ করিতে চাহে, তাহারা যে বিদ্যা অর্থকরী নহে, সেই বিদ্যাগ্রহণেও ঔৎসুক্য প্রকাশ করিতে পারে। কিন্তু সাধারণ লোক অন্ন চিন্তায় জর্জ্জরিত। তাহারা ভবিষ্যৎ জীবনের প্রতি উদাসীন হইয়া সন্তানদিগকে কেবলমাত্র জ্ঞানলাভের জন্য এরূপ নিঃস্বার্থভাবে জাতীয় বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিতে পারে না।

কেহ কেহ মনে করেন, জাতীয় বিদ্যালয়সমূহে কতকগুলি অকর্ম্মণ্য, বিদ্যাভ্যাসে অমনোযোগী ছাত্র প্রবেশ করিয়াছে। যাহারা প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতির নিয়মানুসারে শিক্ষা-লাভে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতে পারে নাই, অথবা যাহারা সাধারণ বিদ্যালয়

সমূহ হইতে, কোন না কোন কারণে বহিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাদিগকে স্থান দেওয়াই জাতীয় বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য। এখানে সচ্চরিত্র ও বিদ্যানুরাগী ছাত্র প্রবেশ করে না।

আর যাঁহারা স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে জাতীয় শিক্ষাপরিষদের জন্ম হইয়াছে ভাবিয়া ইহার প্রবর্ত্তিত শিক্ষাপদ্ধতিকে কেবলমাত্র হুজুগ মনে করেন, তাঁহারা ভাবেন, কতিপয় হুজুগপ্রিয় ব্যক্তির সাময়িক চেষ্টা ও উত্তেজনার ফলে কতকগুলি অপরিণতবয়স্ক যুবক ও বালকদিগের পরকাল নষ্ট করিবার জন্য, দেশের স্থানে স্থানে কতকগুলি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য বিদ্যাদান বা শিক্ষাবিস্তার নহে—দেশের মধ্যে বিবিধ হুজুগে যোগদান করাই ইহাদের বিশেষ লক্ষ্য। ছাত্রেরা কেবলমাত্র বিদ্যালয়ে যাওয়া আসা করে। এই কেন্দ্র গুলিকে বিদ্যালয় বলা যায় না,—শিক্ষকদিগের স্থিরতা নাই,—ছাত্রদিগের প্রতি কোনরূপ শাসনের ব্যবস্থা নাই—প্রকৃত সুদৃঢ় নিয়মও শৃঙ্খলাদ্বারা ছাত্রদিগকে সংযত ও সুচালিত করিবার কোন বন্দোবস্ত নাই।

এতদ্ব্যতীত এই বিদ্যালয়গুলির স্থায়িত্ব সম্বন্ধে সকলেরই সন্দেহ। অনেকের ধারণা, জাতীয় শিক্ষা গবর্ণমেণ্টের পরিচালিত শিক্ষার বিরোধী হইয়া দেশের উপর কর্ত্তৃপক্ষের কোপ ও বিরাগের বর্দ্ধন করিতেছে। বিশেষতঃ, বোধ হয়, জাতীয় বিদ্যালয়ের পাঠ্যনির্ব্বাচন ও কার্য্যনির্ব্বাহ প্রণালী প্রভৃতি বিষয়ের সহিত বিবিধ রাজনৈতিক আন্দোলনের সংশ্রব আছে! হয়ত, রাজদ্রোহ-প্রচারক পুস্তকাদি জাতীয় বিদ্যালয়ে ব্যবহৃত হয়, এবং কোমলমতি

শিশুদিগের হৃদয়ে অল্প বয়সেই রাজবিদ্বেষের বীজ বপন করিয়া দেওয়া হয়; সুতরাং ইহা দ্বারা বালকদিগের ভাবী সর্ব্বনাশের সূচনা এবং দেশে অনর্থক বিবিধ অমঙ্গল সৃষ্টির পথ করা হইতেছে।

বাস্তবিক পক্ষে, কোন দেশের জাতীয় শিক্ষা কোন ব্যক্তি বা সম্প্রদায় বিশেষের কোন এক লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয় না। কোন কালে কোন সমাজেই প্রকৃত জাতীয় শিক্ষা ধর্ম্মশিক্ষায় পর্য্যবসিত হইতে পারে না। যেখানে দেখা যাইবে যে, দেশের সন্তানসন্ততিদিগের শিক্ষা একমাত্র ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠে পরিণত হইয়াছে,—সেখানে বুঝিতে হইবে জাতীয় শিক্ষায় আবর্জ্জনা পড়িয়াছে। জাতীয় শিক্ষায় শিল্পশিক্ষা বা জীবিকা অর্জ্জনের উপযোগী শিক্ষা বুঝায় না। জাতীয় শিক্ষা রাজনৈতিক শিক্ষা নহে; জাতীয় শিক্ষার অর্থ সমরশিক্ষা বা শারীরিক শিক্ষা নহে,—স্ত্রীশিক্ষা বা লোকশিক্ষা নহে; জাতীয় শিক্ষার অর্থ স্বদেশহিতৈষণা শিক্ষাও নহে।

জাতীয় শিক্ষার প্রকৃত তত্ত্ব

সমগ্র সমাজের সর্ব্ববিধ উৎকর্ষের বিকাশ সাধন করিয়া যে শিক্ষাপদ্ধতি জাতীয় প্রকৃতি ও বিশেষত্বের পরিণতি ও পূর্ণতা বিধানের সহায় হয়, সেই জাতীয় চরিত্রের সর্ব্বাঙ্গীণ বিকাশ-সাধনোপযোগী শিক্ষাই প্রকৃতপক্ষে জাতীয় শিক্ষা। যে নামেই অভিহিত হউক, আর যাহার কর্ত্তৃত্ব ও নায়কতায়ই পরিচালিত হউক না কেন, এই শিক্ষাই জাতীয় শিক্ষা নামে অভিহিত হইবার যোগ্য।

মানুষ কতকগুলি বৃত্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করে। প্রকৃতির সাহায্যে ও পারিপার্শ্বিক ভাব ও শক্তিসমূহের প্রভাবে সেই

স্বাভাবিক ব্যক্তিত্ব বিকাশ প্রণালী

সকলের বিকাশ এবং বৃদ্ধি হয়। পারিবারিক, সামাজিক ও দেশের অন্যান্য শক্তির সংঘর্ষে তাহার কৈশোরযৌবনাদি অবস্থা স্বাভাবিক নিয়মেই গঠিত হইতে থাকে। সমাজে বিশেষ কোন সাহায্য না থাকিলেও, মানুষের মন ও শরীর আপনা আপনিই বহির্জ্জগৎ হইতে নিজের উপযোগী উপকরণ সংগ্রহ করিয়া লইয়া পুষ্টিলাভ করিতে পারে। এইরূপে ব্যক্তিত্ব-বিকাশই জীবিত অবস্থার লক্ষণ এবং জীবনী-শক্তির কার্য্য। এই জীবনীশক্তির পুষ্টিসাধন করিয়া মানুষের ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য বিকাশের সহায়তা করা, যথার্থ শিক্ষার উদ্দেশ্য।

অতএব যদি আমাদের শারীরিক ও মানসিক বৃত্তিনিচয়ের সম্যক্ স্ফূর্ত্তিসাধনের জন্য কোন ব্যবস্থা করিতে হয়, তাহা হইলে

শিক্ষাপদ্ধতি ও স্বাভাবিক জীবনবিকাশ

সেই ব্যবস্থাকে এই স্বাভাবিক জীবনগঠন-প্রণালীরই সহায় হইতে হইবে। মানুষকে যদি শিক্ষাগার প্রস্তুত করিতেই হয়, তবে তাহাকে তাহার সমাজের, ধর্ম্মের ও দেশের পূর্ব্বাপর সকল অবস্থা ভাবিয়া, তদনুকূল অতি সুসাধ্য ও সহজ ব্যবস্থা করিতে হইবে। তাহা না করিলে, নৈসর্গিক মনুষ্যত্ব বিকাশের বিঘ্ন উৎপাদন হইবে; এবং তাহার ফলে বিকৃত স্বভাব, অপ্রকৃতিস্থ লোক-সমাজের সৃষ্টি হইবে।

এইজন্যই দেশভেদে ও কালভেদে শিক্ষার স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করা

হইয়া থাকে। এক সমাজে এক সময়ে যাহা স্বাভাবিক ও সহজ, সেই সমাজেরই অবস্থান্তরে তাহা অস্বাভাবিক এবং ক্ষতিকর হইতে পারে। এক অবস্থার প্রতীকার অন্য অবস্থায় ব্যাধির কারণ হওয়া অসম্ভব নহে। সময়ের পরিবর্ত্তনে সমাজের সকল বিষয়েরই পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে; এই পরিবর্ত্তিত অবস্থার উপযোগী না হইলে শিক্ষা-পদ্ধতি 'সেকেলে' থাকিয়া যায়। তখন সেই শিক্ষা-প্রণালী বেশ সহজ উপায়ে পারিপার্শ্বিক নৈতিক ও প্রাকৃতিক শক্তিসমূহ হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিতে পারে না; এবং এই জন্যই উহা বিকৃত হইয়া অর্দ্ধবিকশিত বা কৃত্রিম উপায়ে প্রস্ফুটিত পুষ্পের ন্যায় অস্বাভাবিক রূপ ধারণ করে।

শিক্ষাপদ্ধতির বৈচিত্র্য

চতুষ্পার্শ্বস্থ অবস্থা হইতে প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ দ্বারা কোন বিষয়ের বিকাশ ও পুষ্টি লাভ করিতে হইলে, স্বাধীন ভাবে সেই সকল উপদান ব্যবহার করিবার ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক। শক্তির বিকাশ স্বকীয় চেষ্টা ও দায়িত্বের উপর নির্ভর করে। এমন কি, অপর কোন ব্যক্তি যদি কোন ব্যবস্থা করিবার উপযুক্ত অথবা অধিকার প্রাপ্ত হয়, তাহাকে এই স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এবং উহার সাহায্যগ্রহণ করিয়াই কার্য্য করিতে হইবে।

শিক্ষায় স্বাবলম্বন

সুতরাং যে কোন দেশে এবং যে কোন যুগে শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে, সেই দেশের ও সেই যুগের শিক্ষাগুরুদিগকে

তদ্দেশোপযোগী স্বাভাবিক এবং তৎকালোচিত "আধুনিক" শিক্ষাপদ্ধতি প্রবর্ত্তন করিতে হইবে। সমাজের প্রকৃতি কি, কোথায় ইহার বিশেষত্ব, কোন্ কোন্ বিষয়ে ইহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ও শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় ;—এবং তৎকালের যুগধর্ম্ম কি, অর্থাৎ সেই যুগে পৃথিবীতে কোন্ কোন্ ভাব ও কর্ম্মসমুহ প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, এবং তাহার দ্বারা কিরূপ নূতন অবস্থা সংঘটন হইয়াছে, বা হইবার সম্ভাবনা আছে, এই সকল বিষয়ের আলোচনা না করিলে সকল শ্রমই পণ্ড হইয়া যায়। এইরূপ সমাজোপযোগী এবং তৎকালোচিত "আধুনিক" শিক্ষাপদ্ধতিই স্বাভাবিক, এবং উহাকে জাতীয় শিক্ষা বলা হয়। ইহার দ্বারাই সেই জাতির তৎকালোপযোগী জীবন বিকাশের সুবিধা ঘটে ; এবং সমাজ স্বীয় কর্ত্তব্য সাধন করিতে সমর্থ হইয়া ভবিষ্যৎ জীবনের উন্নতির সহায়তা করে,—ইহাতে মানব-সভ্যতার বিস্তৃতি ও বিকাশের পথ পরিষ্কৃত হইয়া উঠে।

স্বাভাবিক শিক্ষার লক্ষণ

সেই সময়ে একদিকে যেমন পুরাতন প্রথার প্রচলন অথবা উহা স্থায়ী করিতে গেলে, জোর করিয়া এক অনৈসর্গিক ক্রিয়ার অভিনয় করা হয়, তেমনই আবার পুরাতন ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান না হইলে, বালুকার উপর অট্টালিকা নির্ম্মাণের ন্যায়, প্রয়াস বিফল হইয়া যায়। এজন্য সম্প্রদায়প্রবাহ, ধর্ম্মপ্রবাহ, কুলপ্রবাহ ও জ্ঞানপ্রবাহ প্রত্যেকেই প্রতিদিনকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবনপ্রবাহের সহিত মিলিত হইয়া, যাহাতে জাতিপ্রবাহের অঙ্গীভূত হইতে পারে, শাস্ত্রকারদিগকে

একদিকে প্রথমতঃ এরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে ; তেমনই আবার অন্যান্য দেশের মনুষ্যসমাজ এতদিনের কর্ম্ম ও চিন্তাদ্বারা যে ফল প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার সহিত উহার সংযোগ স্থাপনের চেষ্টাও তাঁহাদিগকে করিতে হইবে।

জাতীয় শিক্ষা সমাজোপযোগী

কোন দেশের শিক্ষাপদ্ধতিই জাতীয় চরিত্রের অনুরূপ ও উপযোগী না হইলে, জাতীয় চরিত্রের পরিপূর্ণতাবিধানে সহায় হইতে পারে না। এজন্য জাতীয় প্রকৃতি ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশের অভ্যন্তরে নিজের পারম্পর্য্য ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া যুগে যুগে যে বিশেষত্বের অভিব্যক্তি করিয়াছে, সেই ইতিহাসগত বিশেষত্ব ও চরিত্রগত স্বাতন্ত্র্যের অনুসন্ধান ও সম্যক্ অবধারণ করিয়াই, সমাজের শিক্ষাতত্ত্ববিৎ ব্যক্তিগণকে শিক্ষাক্ষেত্রে চালকরূপে অবতীর্ণ হইতে হইবে। সুতরাং জাতীয় শিক্ষার অর্থ জাতীয় চরিত্রের অনুবর্ত্তনকারী অর্থাৎ স্বাভাবিক শিক্ষা। এজন্যই জাতীয় সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান ও ইতিহাস প্রভৃতির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া চলা জাতীয় শিক্ষার প্রধান অঙ্গ হইয়া পড়ে, এবং জাতীয় ভাষা এই সমুদয়ের প্রবেশদ্বার বলিয়া, সকল দেশের শিক্ষাপদ্ধতিতে সকল বিষয়ে মুখ্য স্থান অধিকার করে।

মধ্যযুগে বিদেশীয় সাহিত্য, বিদেশীয় দর্শন প্রভৃতি শিক্ষালাভ করিবার জন্য ইউরোপের ছাত্রেরা বিদেশীয় ভাষা ব্যবহার করিত। সকলেই আজকাল স্বীকার করেন যে, সেই কারণে সেই সময়ে কোন দেশেই, কি সামাজিক, কি রাষ্ট্রীয়, কি শিক্ষা-সম্বন্ধীয়,

কি বৈষয়িক, কি ধর্ম্মসম্বন্ধীয় কোন বিষয়েই জাতীয় চরিত্র-স্বাতন্ত্র্য ও প্রকৃতি-পার্থক্য জন্মে নাই।

জাতীয় সভ্যতা এবং জাতীয় ভাষা ও সাহিত্যই প্রকৃত জাতীয় শিক্ষার মূল উপাদান হইবার প্রধান কারণ এই যে,—

শিক্ষার ব্যবস্থায় আত্মোপলব্ধির সুযোগ

মানবের জ্ঞান, মানবের ধারণা সকলই আত্মোপলব্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত। নিজের সহিত তুলনা সাধন ও পার্থক্য অনুভব করিয়াই মানব বিশ্বের উপলব্ধি করিতে পারে। মনোবিজ্ঞানের এই সত্যটির উপর শিক্ষা-বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত। এই কারণে স্বাভাবিক জাতীয় শিক্ষাকে প্রকৃত শিক্ষা বা বিজ্ঞানানুমোদিত শিক্ষা বলা যায়।

জাতীয় চরিত্রের বিকাশ-সাধনোপযোগী শিক্ষা একদিকে সমাজানুরূপ, অপরদিকে কালোপযোগী। পারিপার্শ্বিক ভাব ও

শিক্ষাপদ্ধতি কালোপযোগী

শক্তিপুঞ্জের সহিত মানবের সম্বন্ধ, এবং ইহাদের পরস্পর আদান প্রদানেই মানবের স্বভাব বিকাশপ্রাপ্ত হয়; এজন্য প্রত্যেক জাতি স্বকীয় শিক্ষা-পদ্ধতিতে পারিপার্শ্বিক ভাবসমূহকে নিজের স্বতন্ত্র পুষ্টিসাধনের অনুকূলরূপে ব্যবহার করিতে চেষ্টা করে। এই কারণে জাতীয় শিক্ষাকে পারিপার্শ্বিকের উপযোগী শিক্ষা বলা যাইতে পারে।

এই পারিপার্শ্বিক অবস্থা সমূহের কালে কালে পরিবর্ত্তন হয়। এজন্য শিক্ষাপদ্ধতি পরিবর্ত্তিত না হইয়া চিরকাল একরূপই থাকিলে, পরিবর্ত্তিত পারিপার্শ্বিকের ব্যবহার করিতে অনুপযুক্ত হয়, এবং এই কারণে অস্বাভাবিক হইয়া পড়ে; এজন্য জাতীয় শিক্ষা

পরিবর্তনশীল অর্থাৎ কালানুবর্ত্তী। বিশ্বের সভ্যতাশক্তির নূতন নূতন সমাবেশের ফলে যে দেশে বা যে সমাজে সামাজিক, আর্থিক, ও রাষ্ট্রীয় সকল বিষয়েরই পরিবর্ত্তন হইয়াছে, অথচ শিক্ষাপদ্ধতি পুরাতন প্রথাতেই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, সেই দেশে ও সেই সমাজে জাতীয় চরিত্রের বিকাশসাধনে বিঘ্ন উপস্থিত হইয়াছে। সেই সমাজ পারিপার্শ্বিক ভাব ও পদার্থসমূহকে নিজের উপযোগী করিয়া ব্যবহার করিতে অসমর্থ হইয়াছে, সুতরাং জীবনীশক্তি হারাইয়া বিশ্ব-সভ্যতার এক অতি নিম্নস্তর-প্রোথিত অস্থিকঙ্কালের ন্যায় নিস্পন্দ ও অসাড় হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। ইদৃশ শিক্ষা-পদ্ধতিকে আর জাতীয় শিক্ষা বলা যায় না।

পারিপার্শ্বিকের অনুবর্ত্তিতা, কালোপযোগিতা ও পরিবর্ত্তন-শীলতা জাতীয় শিক্ষার লক্ষণ হইবার কারণ এই যে,—শিক্ষার উদ্দেশ্য মানবের জন্য উপযুক্ত সুযোগ সৃষ্টি করিয়া, তাহার ভিতরকার শক্তিগুলি প্রস্ফুটিত করিয়া দেওয়া। সেই সুযোগগুলি প্রাপ্ত হইলে মানবের বৃত্তিসমূহ স্বতই বিকশিত হইয়া পূর্ণতা লাভ করে। কিন্তু সুযোগসমূহের সহিত মানবের কোনরূপ বিরোধ বা বৈষম্য ঘটিলে, এই বিকাশের বিঘ্ন উপস্থিত হয়। যেখানে বিশ্বে বিবিধ সুযোগের সৃষ্টি হইয়াছে, অথচ কোন কোন সমাজে শিক্ষাতত্ত্ববিদেরা অথবা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠাতারা এত উদাসীন যে, সেই সকল সুযোগের উপযুক্ত ব্যবহার করিয়া শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিতে উদ্যোগী হইলেন না, সেই সমাজে শিক্ষাপদ্ধতি অতি

শিক্ষার ব্যবস্থায় যুগধর্ম্মের প্রভাব

পশ্চাতে পড়িয়া রহিবে। নূতন যুগের নূতন সভ্যতার মধ্যে সেই পথভ্রান্ত নির্জ্জীব পুরাতন শিক্ষা কাহারও অবজ্ঞা, কাহারও দয়ার পাত্র, অথবা বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক সমালোচনার উপযুক্ত পদার্থ মাত্র হইয়া থাকিবে। প্রাণবিজ্ঞানের এই সাধারণ তত্ত্বের উপর জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠিত।

কোন সমাজে জাতীয় শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে কিনা, নির্ণয় করিতে হইলে, প্রধানতঃ এই দুইটী প্রশ্ন করিতে হইবে—

[১] মনোবিজ্ঞানের প্রশ্ন—শিক্ষাপদ্ধতি জাতীয় স্বভাবের উপযোগী কিনা—এজন্য

(ক) জাতীয় সভ্যতার বিবিধ অঙ্গের সহিত পরিচিত হইবার সুব্যবস্থা আছে কি না; এবং

(খ) উচ্চতম শিক্ষার আয়োজনে জাতীয় ভাষা ব্যবহারের বিধান আছে কিনা?

[২] প্রাণবিজ্ঞানের প্রশ্ন—শিক্ষা-পদ্ধতি জাতীয় অভাব মোচনের উপযোগী কি না, তৎকালীন বিশ্বের মধ্যে জাতিকে সচেতনভাবে পরিপুষ্ট করিবার ব্যবস্থা আছে কিনা—অর্থাৎ শিক্ষা যুগ-ধর্ম্মের অনুরূপ কিনা?

লোক-শিক্ষা, স্ত্রী-শিক্ষা, ধর্ম্ম-শিক্ষা, শিল্প-শিক্ষা, দেশ-হিতৈষণা শিক্ষা প্রভৃতি সকল বিষয়ই জাতীয় শিক্ষার গৌণ লক্ষণ। এই সমুদয় প্রধান লক্ষ্য হইতে পারে না, ইহারা উপরি উক্ত মুখ্য উদ্দেশ্যসমূহেরই অন্তর্গত। শিল্প, ধর্ম্ম বা রাষ্ট্রনীতির প্রভাবে

শিক্ষা-পদ্ধতি নিয়ন্ত্রিত না হইয়া মানব-বিজ্ঞান, সমাজ-বিজ্ঞান এবং শিক্ষা-বিজ্ঞানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইলেই জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে।

এইরূপ শিক্ষাদানের জন্য শিক্ষানুরাগী অধ্যাপক সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপনের দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যাইবে না। অভাবোপযোগী শিক্ষক তৈয়ারী করিয়া লইবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে হইবে। সে চেষ্টা না করিয়া কেবল গৃহপ্রতিষ্ঠা ও ভূমিক্রয়ে অর্থব্যয় করিলে, বিদ্যালয়ের ভিত্তি স্থাপিত হইবে না।

শিক্ষাপদ্ধতির প্রাণপ্রতিষ্ঠা

এতদ্ব্যতীত, কেবল মাত্র বেঞ্চ, টুলের স্বাতন্ত্র্যে, বিদ্যালয়ের স্বাতন্ত্র্যে, বিদ্যালয়গৃহের স্বাতন্ত্র্যে ও পরিচালনা-সমিতির স্বাতন্ত্র্যে শিক্ষাপদ্ধতির স্বাতন্ত্র্য স্পষ্টীকৃত হয় না। প্রথম হইতেই ছাত্র ও শিক্ষকদিগের চিত্তে শিক্ষার বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রের ধারণা বদ্ধমূল করিয়া দিয়া জ্ঞানানুশীলন, বিদ্যাদান, শিক্ষাবিস্তার, বিজ্ঞান-প্রচার, সাহিত্য-সেবা, পরোপকার প্রভৃতির প্রতি হৃদয়ের আসক্তি জন্মাইয়া দিবার ব্যবস্থা করিয়া দিতে হইবে। তাহা হইলেই প্রকৃত শিক্ষা-সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়া দেশের চিন্তা ও কর্ম্মরাশি স্থির ভাবে নিয়ন্ত্রিত করিতে সমর্থ হইবে।



ভাষা-শিক্ষা-প্রণালী

নানা কারণে আধুনিক কালে শিক্ষণীয় বিষয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। পূর্ব্বে সভ্যজগতের এমন এক অবস্থা ছিল, যখন

শিক্ষণীয় বিষয়ের বহুলতা

কেবল ধর্ম্ম, ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষাই শিক্ষার্থীর একমাত্র সাধনা ছিল। ক্রমশঃ মানবসমাজ যে অবস্থায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে কেবলমাত্র ধর্ম্ম, ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষা করিলেই জীবনের সর্ব্ববিধ অভাব মোচন হয় না। এখন বাহ্য জগতের নিয়মগুলি আবিষ্কার করিয়া বৈজ্ঞানিকেরা যে সমুদয় নূতন বিদ্যার প্রতিষ্ঠা করিতেছেন, সেই বিজ্ঞানসমূহের সত্যগুলি আয়ত্ত করিতে না পারিলে মানবের যথেষ্ট অজ্ঞতা থাকিয়া যায়। কাজেই বিজ্ঞান আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতির মধ্যে ভাষা ও সাহিত্যের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া পড়িয়াছে। এতদ্ব্যতীত, বর্ত্তমান জগতের জীবনসংগ্রামোপযোগী বিবিধ অস্ত্রের অধিকারী হইবার জন্য আধুনিক শিল্পপ্রথা এবং ব্যবসায়পদ্ধতিও শিক্ষা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। ফলতঃ বর্ত্তমান যুগে শিক্ষার্থীর পক্ষে বিজ্ঞান ও ব্যবসায় সাহিত্যের সঙ্গে সমানভাবে প্রয়োজন হইয়াছে।

শিক্ষণীয় বিষয়ের সংখ্যা বাড়িয়াছে বটে; কিন্তু এই সমুদয় শিক্ষা করিবার উপযোগী সময় শিক্ষার্থীর পক্ষে সমানই রহিয়াছে। পূর্ব্বে যে সময়ের মধ্যে ভাষা ও সাহিত্য প্রভৃতি শিক্ষা করিয়া

প্রণালীর আবশ্যকতা

শিক্ষার্থী সংসারের জীবনসংগ্রামোপযোগী বিবিধ উপাদান সংগ্রহ ও অভিনব আলোচনা করিতে সমর্থ হইত, এখনও তাহাকে সেই পরিমাণ সময়ের মধ্যেই আধুনিক কালের অনুরূপ উপকরণসমূহ সংগ্রহ করিতে হয়। কাজেই অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার বিশিষ্ট উপায় উদ্ভাবন আধুনিক কালে চিন্তাজগতের প্রধান কার্য্য হইয়া পড়িয়াছে। যে প্রণালীতে অল্প সময়ে বহু বিষয় আয়ত্ত করিতে পারা যায়, সেরূপ প্রণালী অবলম্বন না করিলে আজকাল জীবনের উন্নতি আশা করা বৃথা। আর বাস্তবিক, সময় লাঘব করিয়া মানবের শক্তিগুলি বহুবিধ কার্য্যে প্রয়োগ করিবার সুবিধা সৃষ্টির জন্যই প্রাচীন ও মধ্য যুগের অধ্যয়নপ্রণালী ও চিন্তাপদ্ধতি পরিহার করিয়া নূতন নূতন শিক্ষা-প্রণালী আবিষ্কারের প্রয়োজন উপস্থিত এবং প্রবৃত্তি জাগরিত হইয়াছে।

ভাষা শিক্ষার নূতন প্রণালী

সুতরাং অধ্যয়নের যে প্রণালী অবলম্বন করিয়া সংস্কৃত সাহিত্যের কোনও এক বিভাগ আয়ত্ত করিতেই চিরজীবন কাটিয়া যাইত, অথবা সাত বৎসরব্যাপী পরিশ্রমের পর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া রঘুবংশের সাত-সর্গ মাত্র কোনরূপে মুখস্থ করিবার শক্তি জন্মিত, সেই প্রণালী এখন আর কোন মতেই কালোপযোগী হইতে পারে না। এমন এক শিক্ষাপ্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে, যাহার দ্বারা বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয়গুলিকে আয়ত্ত করিবার প্রয়াসের মধ্যে পরস্পর-সহায়ক সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হয়, যাহার দ্বারা ভাষা ও সাহিত্য

শিক্ষা করিবার সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞান ও ইতিহাসাদি শিক্ষা, এবং বিজ্ঞান ও ইতিহাসাদি শিক্ষা করিবার সঙ্গে সঙ্গে ভাষা ও সাহিত্যে অধিকার লাভ হয়।

ভাষা ও ভাবের সম্বন্ধ, ভাষার উৎপত্তি, প্রকৃতি এবং ক্রমিক বিকাশের নিয়মের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই ভাষাশিক্ষার প্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে। কোন ভাষা শিক্ষা করিতে হইলে বক্তব্য ও ভাবসমূহের প্রতিই বিশেষ মনোযোগী হইতে হইবে। এজন্য বাক্যরচনা ও পদযোজনাকেই একমাত্র উপাদান ভাবে গ্রহণ করিতে হইবে। বাক্যরচনায় নৈপুণ্য জন্মিলেই ভাষা আয়ত্ত হইতে পারে, নতুবা নহে। এজন্য অভিধান হইতে বাছিয়া বাছিয়া শব্দ মুখস্থ বা ব্যাকরণের নিয়ম আবৃত্তি করিবার আদৌ কোন প্রয়োজন নাই। অধিক সংখ্যক শব্দ, বা উচ্চারণ করিতে কঠিন যুক্তাক্ষর-বিশিষ্ট শব্দের অর্থ জানিলেই ভাষায় ব্যুৎপত্তি জন্মিতে পারে না। কারণ কেবলমাত্র কঠিন কঠিন শব্দেই ভাষা কঠিন হয় না। ভাব কঠিন হইলেই প্রকৃত পক্ষে ভাষা কঠিন হয়। সহজ ভাব প্রকাশ করিবার জন্য কঠিন শব্দ ব্যবহার করিলেও অনেক সময়ে ভাষার কাঠিন্য প্রতীয়মান হয় না; অথচ কঠিন ভাব প্রকাশ করিতে যাইয়া অযুক্তাক্ষরবিশিষ্ট অতি সরল শব্দ ব্যবহার করিলেও অনেক সময় ভাষা কঠিনই থাকিয়া যায়। সুতরাং প্রথম হইতেই কঠিন বা বহুসংখ্যক শব্দ-শিক্ষায় প্রবৃত্ত না হইয়া

ক্ষুদ্র ও সরল বাক্য সমূহের রচনা হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ প্রণালীবদ্ধ বাক্য পরম্পরা রচনা

শিক্ষার্থীর স্বীয় ভাবপ্রকাশোপযোগী বাক্যরচনা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করা উচিত। ভাবসমূহ বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যেমন কঠিন ও জটিল হইতে থাকিবে তেমনি তাহাকে কঠিন ও জটিল বাক্যের সাহায্য অবলম্বন করিতে হইবে, ক্রমশঃ সে ভিন্ন ভিন্ন পরস্পরবিচ্ছিন্ন বাক্যসমূহ পরিত্যাগ করিয়া শৃঙ্খলীকৃত ও সুসম্বদ্ধ এবং ঐক্যবিশিষ্ট বাক্যপরম্পরা অবলম্বন করিবে।

মাতৃভাষা শিক্ষা

মাতৃভাষা শিক্ষা করিতে হইলে শিক্ষার্থীকে প্রথম হইতেই তাহার আজন্মব্যবহৃত বাক্যরচনা-প্রণালী তাহার সর্ব্ববিধ মনোভাব প্রকাশে প্রয়োগ করিতে হইবে। এই প্রয়োগ সম্বন্ধে কতকগুলি সাধারণ নিয়ম নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

(১) বিশ্বের যাবতীয় পদার্থ-বিষয়ক বাক্যরচনা

প্রথমতঃ, সমগ্র জ্ঞেয় বিশ্ব তাহার মনোবৃত্তি-নিচয়ের বিকাশের কারণ। সুতরাং কি প্রাকৃতিক, কি মানবীয় উভয় জগৎই তাহার বাক্যপ্রয়োগের ক্ষেত্র। এজন্য তাহার বাক্যরচনা কোন এক পদার্থ বা এক বস্তুতে আবদ্ধ না করিয়া সর্ব্ব পদার্থ এবং জগতের সর্ব্ববিধ ঘটনাতেই প্রয়োগ করিতে হইবে। ইহাতে একদিকে তাহার ভাষার বৈচিত্র্য ও শৃঙ্খলা জন্মে, অপরদিকে বিশ্বের বিবিধ সজীব ও নিৰ্জ্জীব পদার্থ সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মিবার পক্ষে সহায়তা হয়। ইহার ফলে শিক্ষার্থী কেবলমাত্র ভাষাই শিক্ষা করে না, ভাষার সঙ্গে সঙ্গে ভাব ও ধারণার সৃষ্টি এবং জ্ঞান বিকাশের উপযোগী বিবিধ বিদ্যাও শিক্ষা করে। সুতরাং ভাষা

শিক্ষার সময়ে যদি শিক্ষার্থী অন্যান্য বিভাগের অধীত বিদ্যালব্ধ জ্ঞান প্রকাশ করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে সকল বিদ্যার মধ্যে পরস্পর সহায়তাবিধায়ক সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হইয়া যায়। ইহাতে সময় ও পরিশ্রমের লাঘব হয়, ভাষা শিক্ষা জীবন্ত হয় এবং অন্যান্য বিদ্যাবিষয়ক জ্ঞানের ভিত্তি দৃঢ় হইতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ, বয়সের তারতম্যানুসারে বাক্যরচনাপ্রয়োগের ক্ষেত্রের এবং বাক্যরচনা প্রণালীর তারতম্য হওয়া উচিত।

(২) ভিন্ন ভিন্ন বয়সে বিভিন্ন পদার্থ বিষয়ক বাক্য এবং বিবিধ রচনা প্রণালী অবলম্বন

সমগ্র জগৎই শিক্ষার্থীর জ্ঞেয় বটে, কিন্তু সমগ্রটা একই বয়সে জ্ঞেয় নহে। এই জন্য প্রত্যেক স্তরে শিক্ষার্থীর সুপরিচিত পদার্থ এবং প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহেই বাক্যরচনা-প্রণালী আবদ্ধ রাখিতে হইবে। সুতরাং জ্ঞেয় পদার্থসমূহের মধ্যে বিভাগ ও বিশ্লেষণ সাধন করিয়া সুবোধ্য অংশগুলিকেই বাক্য-রচনার বিষয় করিতে হইবে। এই উপায়ে ক্রমশঃ বিশ্বের যাবতীয় পদার্থ শিক্ষার্থীর ভাষার আয়ত্ত করিতে হইবে।

তৃতীয়তঃ, কোন পদার্থের বর্ণনা করিতে হইলে শিক্ষার্থী যে

(৩) অভ্যস্ত বাক্য সমূহের সাহায্য গ্রহণ করিয়া নূতন বাক্যরচনা

বাক্য কয়েকবার রচনা করিয়াছে, সেই বাক্যসমূহেরই সাহায্যে তাহার নূতন বাক্য-রচনা শিক্ষা করিতে হইবে। যে বিষয়ে কখনও কোন আলোচনা হয় নাই, তাহার সহিত পূর্ব্বপরিচিত বা আলোচিত বিষয়ের যদি কোনরূপ সম্বন্ধ

না থাকে, তাহা হইলে সেই নূতন বিষয় সম্বন্ধে বাক্যরচনা করিতে চেষ্টা করা উচিত নহে। পূর্ব্বের অভ্যাস অবলম্বন করিয়াই নূতন প্রয়াস করিতে হইবে। সুতরাং বাক্য হইতে বাক্যান্তরে গমন করিবার সময়ে ভাব হইতে ভাবান্তর গমনের স্বাভাবিকতা এবং সুবিধা-অসুবিধা বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে।

চতুর্থতঃ, কোন বিষয়ে শিক্ষার্থীকে একেবারেই বহু বাক্য রচনা করিতে হইবে না। বাক্যসমূহ প্রথম অবস্থায় সরল ও অ-জটিল থাকা বাঞ্ছনীয়। প্রথম অবস্থায় বাক্যসমূহ বৈচিত্র্যপূর্ণ ও সূক্ষ্মভাব ব্যঞ্জক না হইয়া স্থূল গুণবাচক এবং সহজ ভাবজ্ঞাপক হওয়া উচিত।

(৪)
প্রথমতঃ সরল ও সহজ বাক্যরচনা

পঞ্চমতঃ, উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বিচিত্র ভাবপ্রকাশোপযোগী বিচিত্র বাক্য-রচনা শিক্ষা করিতে হইবে। জ্ঞেয় জগৎ সম্বন্ধে ক্রমশঃ সূক্ষ্ম ও বিস্তৃতভাবে বাক্য রচনা করিতে হইবে। এই উপায়ে বাক্যসমাবেশের রীতি, লিপিচাতুর্য্য ও রচনাকৌশল শিক্ষা করিতে করিতে প্রবন্ধাদি উচ্চ সাহিত্য রচনা শিক্ষা করিতে হইবে।

(৫)
প্রথমতঃ অসম্বদ্ধ পৃথক্ বাক্যরচনা

এইরূপ বাক্যরচনাদ্বারা ভাষার প্রণালী আয়ত্ত করিতে পারিলে, শব্দ-সম্পদ্ বৃদ্ধি পাইবে। উচ্চ-সাহিত্য পাঠ করিবার জন্য অভিধানের সাহায্য

অভিধান ও ব্যাকরণ

গ্রহণ করিয়া প্রচলিত শব্দের সহিত পরিচিত হইতে হইবে এবং আলোচিত সাহিত্য হইতেই শব্দ বাছিয়া লইয়া প্রয়োগ করিতে শিক্ষা করিতে হইবে।

এই উপায়ে কথা বলিয়া এবং প্রবন্ধ লিখিয়া ভাষার প্রয়োগ সম্বন্ধে নৈপুণ্য ও অভিজ্ঞতা জন্মিলে ভাষার অন্তর্নিহিত সূত্রসমূহ বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে হইবে। ভাষা ব্যবহার করিতে অভ্যাস করিয়া এবং ভাষার প্রয়োগ দেখিয়া ভাষার মধ্যে যে বাক্য-রচনা-প্রণালী অবলম্বিত হইয়াছে, যুক্তিদ্বারা সেই প্রণালীর আলোচনা এবং তাহার নিয়মসমূহ ও বৈয়াকরণিক রীতিগুলি আবিষ্কার করিতে হইবে। ব্যাকরণ ভাষার ন্যায়শাস্ত্র। ভাষা শিক্ষার জন্য ইহার কোন প্রয়োজন নাই। ন্যায়শাস্ত্রের বিশেষ এক অঙ্গ বলিয়া ব্যাকরণের স্বতন্ত্র আলোচনা সঙ্গত।

অন্যান্য ভাষা-শিক্ষা-প্রণালী

অন্যান্য ভাষা শিক্ষা করিতে হইলেও মাতৃভাষা শিক্ষার প্রণালীই অবলম্বন করিতে হইবে। সেই ভাষাকে মাতৃভাষার ন্যায় মনে করিয়া, সকল বিষয়ে মাতৃভাষা শিক্ষা-প্রণালী গ্রহণ করিতে হইবে। সকলেই লিখিতে ও পড়িতে শিক্ষা করিবার পূর্ব্বেই নিজ মাতৃভাষায় কথা বলিয়া ভাব প্রকাশ করে। অন্যান্য ভাষা শিখিবার সময়েও সেইরূপ সেই ভাষাতেই নিজ মনোগতভাব প্রকাশ করিবার চেষ্টাই প্রথম করিতে হইবে।

যে ভাষা শিখিতে হইবে, তাহার শব্দ-শিক্ষা গৌণভাবে রাখিয়া প্রথম হইতেই সেই ভাষাতে কথা বলিতে শিক্ষা করিতে

হইবে। সেই ভাষার বর্ণমালার সহিত পরিচিত হইবার পূর্ব্বেই সেই ভাষায় বাক্যগুলি শুনিয়া শুনিয়া উচ্চারণ করিতে হইবে; এবং কেবল পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ দ্বারা শব্দগুলি অভ্যস্ত হইলে, সেই সকল শব্দ লইয়া সেই ভাষায় বাক্যরচনা করিতে হইবে। সেই ভাষায় ভাব প্রকাশ করিবার যে বিশেষ প্রণালী আছে, যে উপায়ে সেই ভাষা ব্যবহারকারী ব্যক্তিরা বাক্যরচনা ও পদযোজনা করিয়া থাকে, ঠিক সেই প্রণালীর সহিত সম্যক্ পরিচিত হইয়া, তাহার সাহায্যে নিজের প্রয়োজনমত বাক্যরচনার চেষ্টা নিজে করিতে হইবে।

কেবলমাত্র কোন এক বিভাগের বাক্যরচনাতেই সেই প্রণালী-প্রয়োগে সন্তুষ্ট না থাকিয়া, জগতের প্রত্যেক বিষয়েই তাহার ব্যবহার করিতে হইবে। প্রথমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, অসম্বদ্ধ এবং স্থূল ভাব প্রকাশ করিতে অভ্যস্ত হইয়া ক্রমশঃ জটিল, সুসম্বদ্ধ ও সূক্ষ্মভাব প্রকাশ করিতে শিখিতে হইবে। এই উপায়ে ক্রমশঃ সেই ভাষায় বাক্য-পরম্পরা রচনা করিয়া প্রবন্ধ ও সাহিত্যে অধিকার-লাভের চেষ্টা করিতে হইবে।

এইরূপে ভাষায় প্রবেশলাভের পর ভাষার নিয়ম ও ইতিহাস এবং সাহিত্যের ইতিবৃত্তের সহিত পরিচিত হওয়া আবশ্যক।

কি মাতৃভাষা, কি অন্যান্য ভাষা, সকল ভাষাই শিক্ষা করিতে হইলে, সর্ব্বদা বিশেষভাবে মনে রাখিতে হইবে যে, প্রথমতঃ ভাষা ও সাহিত্য দুইটী স্বতন্ত্র পদার্থ। ভাষা শিক্ষা করা এবং সাহিত্য শিক্ষা করা একই বিষয় নহে। মনের ভাব প্রকাশ-

করিতে পারিলেই ভাষার কার্য্য সিদ্ধ হইল। এই ভাবপ্রকাশ যে উপায়ে অতি সুন্দররূপে সম্পন্ন হইতে পারে, সেই উপায়ই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ভাষা।

ভাষা শিক্ষার সাধারণ নিয়ম

(১) ভাষা সাহিত্য নহে

সুতরাং ভাষা-শিক্ষায় প্রবৃত্ত হইয়া শিক্ষার্থীকে সেই উপায়গুলির সহিতই পরিচিত হইতে হইবে। সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রণালীতে মনের ভাব প্রকাশ করিতে পারিলেই সর্ব্বোৎকৃষ্টরূপে ভাষার ব্যবহারও করা হইল বলিতে হয়। ভাষার উৎকর্ষ সাধিত হইলেই ভাবের উৎকর্ষ সাধিত হয় না। নিকৃষ্ট ভাবসমূহও উৎকৃষ্ট ভাষার ভিতর দিয়া প্রকাশিত হইতে পারে।

এই ভাবসমূহই সাহিত্যের উপাদান। উচ্চ অঙ্গের উৎকৃষ্ট ভাবসমূহ শিক্ষা করিলেই উচ্চসাহিত্য শিক্ষা করা হয়। আবার, উৎকৃষ্ট ভাব হইলেই ভাষা উৎকৃষ্ট হয় না। অতি সুন্দর ভাবসমূহও নিকৃষ্ট ভাষায় প্রকাশিত হইতে পারে।

সুতরাং ভাবের ক্রমবিকাশের ফলে সাহিত্যের পুষ্টি, এবং ভাব-প্রকাশের উপায়ের ক্রমবিকাশের ফলে ভাষার উৎকর্ষ। ভাষা ও সাহিত্যের গতি দুই বিভিন্ন পন্থা অনুসরণ করে।

(২) ভাষা শিক্ষা ও সাহিত্য শিক্ষার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে হইবে

দ্বিতীয়তঃ, ভাষা শিক্ষা করিবার জন্য বাক্যরচনা করিতে যাইয়া চিন্তাশক্তির বিকাশোপযোগী যে ভাব সমূহ প্রকাশ করিতে শিক্ষা করা হয়, তাহা-দ্বারা সেই সঙ্গে সঙ্গেই সাহিত্যেও প্রবেশলাভ হইয়া থাকে। এইরূপ কিয়ৎকাল যুগপৎ

ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষার পরে, যে অবস্থায় ভাষায় ব্যুৎপত্তি জন্মিয়াছে বলিয়া আশা করা যায়, সেই অবস্থায় মুখ্যভাবে সাহিত্য-শিক্ষার জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করিতে হইবে। তখন ভাষার নিয়ম ও ইতিবৃত্ত শিক্ষা করিবার ভিন্ন বন্দোবস্ত করা উচিত, এবং সঙ্গে সঙ্গে অভিধান ব্যবহার করিয়া শব্দ-সম্পদ বৃদ্ধি করিতেও চেষ্টা করা সঙ্গত। ইহার ফলে ভাষা ও সাহিত্যের স্বাতন্ত্র্য প্রথম হইতেই অনুভূত হইয়া থাকে।

তৃতীয়তঃ, ভাষা প্রধানতঃ বাচনিক এবং মৌখিক। ধ্বনিই ইহার প্রাণ,—কর্ণই ইহার বিজ্ঞাপক। সুতরাং ভাষা-শিক্ষায় ধ্বনি-প্রকাশক মৌখিক কথার অবলম্বনই প্রধানরূপে গ্রহণ করিতে হইবে। লিখিত হইলে ভাষা সম্পূর্ণ নূতন হইয়া যায়। ইহাতে ভাষার সার্থকতা নষ্ট হয়। সুতরাং শিক্ষার্থী ভাষা লিখিতে আরম্ভ করিলে, বুঝিতে হইবে, সে সম্পূর্ণ নূতন এক বিষয় শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

(৩) লিখিতে পড়িতে ও বানান করিতে শিখিবার পূর্ব্বে ভাষা ব্যবহার করিতে হইবে

লিখনদ্বারা অন্যভাবে ভাষা-শিক্ষার যথেষ্ট সাহায্য হয় বটে এবং ভাষা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই লিখিতে শিক্ষা করিবার প্রয়োজনও আছে বটে; কিন্তু কেবলমাত্র ভাষা শিখিতে হইলে লিখন-প্রণালীর আদৌ কোন প্রয়োজন নাই। এজন্য লিখিতে শিক্ষা করিবার পূর্ব্বেই মুখে মুখে ভাষা শিক্ষা করিতে হইবে। ইহাতেই ভাষা শিক্ষার উদ্দেশ্য রক্ষা হইবে এবং এই প্রণালী জীবন্তরূপে কার্য্য করিবে।

ভাষাশিক্ষার ক্রম-বিভাগ

ভাব ও ভাষার প্রকৃতি আলোচনা করিলে ভাষাশিক্ষা-প্রণালী সম্বন্ধে এই কয়েকটী সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। প্রথমতঃ, বাক্য ভাষার প্রধান লক্ষণ; সুতরাং লিখিতে, পড়িতে ও বানান করিতে শিক্ষা করিবার পূর্ব্বেই বাক্য রচনা করিতে শিখিতে হইবে।

ভাষা শিক্ষা সম্বন্ধে কয়েকটি নিয়ম

দ্বিতীয়তঃ, যে ভাষা ব্যবহার করা হইতেছে, বাক্য-রচনা করিতে হইলে তাহারই বিশেষ প্রণালী অবলম্বন করিয়া পদার্থ সমূহের সম্বন্ধ ব্যক্ত করিতে অভ্যস্ত হইতে হইবে।

তৃতীয়তঃ, ভাষা শিক্ষা করিবার জন্য জগতের পরিচিত পদার্থ সমূহ হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ অপরিচিত পদার্থ সম্বন্ধে ভাব প্রকাশের নিমিত্ত বাক্য রচনা করিতে হইবে; এই উপায়ে অন্যান্য বিদ্যালাভের সঙ্গে সঙ্গে সেই বিদ্যালব্ধ জ্ঞানবিষয়ে বাক্যের প্রয়োগ শিক্ষা করিতে হইবে। ইহার ফলে ভাষা শিক্ষার সঙ্গে অন্যান্য বিষয়ও আয়ত্ত হইয়া যাইবে।

চতুর্থতঃ, প্রথম অবস্থায় প্রত্যেক বিষয়ে পরস্পর বিচ্ছিন্ন বাক্য রচনা করিতে অভ্যস্ত হইয়া ক্রমশঃ বাক্যপরম্পরা দ্বারা সামঞ্জস্যবিশিষ্ট ভাব প্রকাশ করিতে হইবে।

পঞ্চমতঃ, বিবিধ ভাব প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন পদার্থ সম্বন্ধে বিচিত্র বাক্য রচনা করিতে অভ্যস্ত হইয়া ভাষার বিশেষ পদ্ধতির সহিত সম্যক্ পরিচিত হইলে, সাহিত্য শিক্ষার স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করিতে হইবে।

ষষ্ঠতঃ, যে অবস্থায় সাহিত্য-শিক্ষার স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করা হইবে, সেই অবস্থায় ভাষার অভিধান ব্যবহার শিক্ষা করিতে হইবে।

সপ্তমতঃ, তৎপরে ভাষার নিয়ম অর্থাৎ ব্যাকরণ এবং ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস শিক্ষা করিয়া ভাব ও ভাবপ্রকাশের উপায়ের সহিত পরিচয় লাভ করিতে হইবে।

ভাষাশিক্ষার পর্য্যায়

এই উপায়ে ভাষা আয়ত্ত করিতে হইলে, শিক্ষা প্রণালী কয়েকটী পর্য্যায়ে বিভক্ত করিতে হইবে।

প্রথম পর্য্যায়—বাক্য-রচনা। প্রথমতঃ, বয়সের তারতম্যানুসারে বিভিন্ন পদার্থবিষয়ক; দ্বিতীয়তঃ, অসম্বদ্ধ হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ প্রণালীবদ্ধ বাক্য পরম্পরা ব্যবহার। তৃতীয়তঃ, স্বতন্ত্র সাহিত্যশিক্ষা।

দ্বিতীয়পর্য্যায়—অভিধান-শিক্ষা। প্রথমতঃ ভাষাতে যে সমুদয় Idiom ও Phrase প্রভৃতি বিচিত্র শব্দগুচ্ছ ব্যবহৃত হয়, তাহাদের সহিত পরিচিত হইতে হইবে; দ্বিতীয়তঃ, সাহিত্যে যে সমুদয় ঐতিহাসিক বা শাস্ত্রীয় উল্লেখ Allusions, References প্রভৃতি সুপ্রচলিত, সেগুলির পূর্ণ বিবরণের সহিত পরিচিত হইতে হইবে।

তৃতীয় পর্য্যায়—ভাষার নিয়ম ও ইতিহাস শিক্ষা। বাক্য-রচনা শিক্ষারদ্বারা ভাষাকে আয়ত্ত করিবার পর ভাষার মৌলিক উপাদানগুলি বিশ্লেষণ করিয়া, তাহার সাধারণ নিয়মগুলি

আবিষ্কার করিতে হইবে। চিন্তাশক্তির বিশেষ বিকাশ না হইলে, এই বিশ্লেষণকার্য্য সমাধা হইতে পারে না, কারণ প্রকৃত পক্ষে ইহা ন্যায়শাস্ত্রের কার্য্য। যে বয়সে এবং যে পরিমাণ সাধারণ জ্ঞান বিকাশের পর ন্যায়শাস্ত্রে অধিকার জন্মিবার সম্ভাবনা, তাহার পূর্ব্বে ভাষা-ঘটিত ন্যায়শাস্ত্রেও অধিকার জন্মিবার সম্ভাবনা নাই; সুতরাং ততটা জ্ঞানলাভের পূর্ব্বে ভাষার সূত্র বা ব্যাকরণ-শাস্ত্র শিক্ষা করা যুক্তিসঙ্গত নহে।

বাক্য-রচনা শিক্ষা করিবার সময়েই ব্যাকরণের নিয়মগুলি অজ্ঞাতসারে ব্যবহার করিতে হইয়াছে বটে; কিন্তু তখনও ব্যাকরণের নিয়মগুলি অভ্যাস করিবার প্রয়োজনীয়তাই উদ্ভূত হয় না। কারণ দেখা যায় যে, একেবারে অশিক্ষিত ব্যক্তি এবং শিশুও ভাষা প্রয়োগ করে, তাহারা অতর্কিতে ব্যাকরণের কতকগুলি সামান্য নিয়ম মানিয়া লইয়াই ভাষা প্রয়োগ করে, তজ্জন্য তাহাদিগের ব্যাকরণের নিয়মসমূহ মুখস্থ করিবার প্রয়োজন হয় না; সেই সকল নিয়ম এত সহজ ও সরল যে তাহা শাস্ত্রোপদেশ ব্যতীত কেবল কথোপকথন দ্বারাই আয়ত্ত হইয়া যায়। শিক্ষা-প্রণালীতেও এই স্বাভাবিক নিয়ম স্বীকার করিয়া লইতে হইবে।

দ্বিতীয়তঃ, ভাষার ইতিহাস। ব্যাকরণের নিয়ম শিক্ষা করিতে করিতেই ভাষার ইতিহাস অনেক পরিমাণে আয়ত্ত হইয়া আসে। ব্যাকরণ-শিক্ষার সময়ে ইহার ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টি রাখিলেই এই কার্য্য সহজে সুসাধ্য হইতে পারে।

চতুর্থপর্য্যায়—সাহিত্যের ইতিহাস-শিক্ষা। যুগে যুগে যে সকল প্রধান প্রধান ভাব ভাষার সাহায্যে প্রকাশিত হইয়া সাহিত্যের বিকাশ, পুষ্টি ও বৈচিত্র্য সৃষ্টি করিয়াছে, সেই ভাবসমূহ এবং তাহাদের প্রকাশকগণের বিবরণ গ্রহণ করিতে হইবে।

শিক্ষার আন্দোলন ও প্রচারক

আমাদের সমাজে শিক্ষার যথেষ্ট অভাব। প্রথমতঃ, নিম্নশ্রেণী এবং স্ত্রীসমাজ শিক্ষালাভ হইতে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত রহিয়াছে বলিলেই চলে। ইহাদের জন্য কিরূপ শিক্ষা-প্রণালী উপযোগী হইবে তাহা এখনও বিশদ-ভাবে আলোচিত হয় নাই; এবং কোন প্রণালীই বিস্তৃত বা সুশৃঙ্খলভাবে কার্য্যে পরিণত করিবার আয়োজন করা হয় নাই।

শিক্ষার বর্ত্তমান অবস্থা

নৈশ-বিদ্যালয়ে কিরূপ শিক্ষা প্রদান করা হইবে এখনও তাহার সুচারু বন্দোবস্ত করিবার সুযোগ ঘটিয়া উঠে নাই। যাহারা নিতান্ত নিঃস্ব এবং যাহাদিগকে দিবাভাগের সর্ব্বক্ষণই শারীরিক পরিশ্রম করিয়া পিতামাতার সঙ্গে জীবিকা অর্জ্জনের চেষ্টা করিতে হয়, কেবল তাহারাই নৈশ-বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইয়া থাকে। সুতরাং ইহাদের পক্ষে দিনে দুই ঘণ্টার বেশী সময় শিক্ষার জন্য ব্যয় করা অসম্ভব।

দরিদ্র সমাজে শিক্ষাবিস্তার

সমাজে এই শ্রেণীর লোকসংখ্যা যত কম হয়, ততই জাতীয় মঙ্গল। অতি শৈশবকাল হইতেই বালকগণ শারীরিক পরিশ্রম করিতে বাধ্য হইয়া মানসিক ও নৈতিক উন্নতি-সাধন করিবার সুবিধা হইতে বঞ্চিত হইলে সমাজের মধ্যে একটা প্রধান অসম্পূর্ণতা থাকিয়া যায়। কিন্তু যতদিন দেশের আর্থিক অবস্থার উন্নতি বিশেষভাবে না হয় এবং জাতীয় ধনভাণ্ডার বৃদ্ধিপ্রাপ্ত

হইয়া জনসাধারণের বৈষয়িক অবস্থার সচ্ছলতা আনয়ন না করে, ততদিন অভিভাবকগণকে শিক্ষার উপকারিতা, অথবা বিদ্যার অশেষগুণ সম্বন্ধে বিশদরূপে বুঝাইয়া দিলেও এ দুঃখ ঘুচিবার সম্ভাবনা নাই। সুতরাং দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় কেবল মাত্র রাত্রিকালে দুই ঘণ্টা শিক্ষালাভ করিতে পারে, এরূপ এক সমাজ থাকিবেই ইহা মানিয়া লইয়া শিক্ষা-সমিতির নৈশ-পাঠশালার বন্দোবস্ত করা উচিত : এবং ইহাদের পৈতৃক ব্যবসায় ও দৈনিক কার্য্যের উপযোগী হয় এরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা করা সঙ্গত।

বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতি সমাজের অনুপযোগী

বর্ত্তমান শিক্ষা-প্রণালীর দোষ পল্লীবাসিগণ বেশ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছেন। তাঁহারা বুঝিয়াছেন যে, যে নিয়মে শিক্ষা চলিতেছে তাহাতে ছাত্রদিগের বহু সময় বৃথা নষ্ট হয়। শারীরিক শক্তির হ্রাস হয় এবং স্বাধীনভাবে চিন্তা ও কর্ম্ম করিবার শক্তি থাকে না। শিক্ষার ব্যবস্থায় অন্নসংস্থানের বিশেষ কোন সুবিধাও নাই : তাহার উপর ছাত্রগণ জাতিগত ব্যবসায় ও গৃহস্থালীর প্রতি অমনোযোগী হইয়া বাবুয়ানা এবং বিলাস শিক্ষা করে,—পৈতৃক জীবিকা অর্জ্জনের উপায় ভুলিয়া গিয়া উদরান্নের চিন্তায় অস্থির হইয়া পড়ে এবং সমস্ত পরিবারকে দুর্ভিক্ষের কবলে নিক্ষিপ্ত করে।

সমাজোপযোগী শিক্ষার লক্ষণ

অশিক্ষিত সমাজকে শিক্ষাগ্রহণ বিষয়ে উৎসাহিত করিতে হইলে এরূপ শিক্ষাপদ্ধতি অবলম্বন করা আবশ্যক যে তাহাতে নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি থাকে—

(১) অল্পসময়ে অধিক শিক্ষা। আজকাল গ্রাম্য বিদ্যালয়ে

নয় দশ বৎসর না পড়িয়া বালকগণ ছাত্রবৃত্তি বা মাইনর পরীক্ষার উপযুক্ত হইতে পারে না। ঐ পরিমাণ শিক্ষা পাঁচ বৎসরের মধ্যেই সম্পন্ন হইয়া যাইতে পারে।

(২) প্রথম হইতেই জাতি-নির্বিশেষে শিল্প ও ব্যবসায়-শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা।

(৩) পুস্তকের সংখ্যার অল্পতা। শিক্ষা-প্রণালীতে বস্তু-পরিচয়ের প্রাধান্য।

(৪) ছোট-বড়, দীন-দরিদ্র, চাষা-ভদ্র সকলকে একই শিক্ষা-প্রদান এবং এই উপায়ে শিক্ষিত অশিক্ষিত সমাজদ্বয়ের মধ্যে অনৈক্য-নিবারণ ও সদ্ভাব-বর্দ্ধন।

(৫) শিক্ষাকে প্রতি গৃহস্থের প্রত্যেক বালকের আয়ত্ত করিবার জন্য অবৈতনিক, অর্দ্ধবৈতনিক বা অল্পবৈতনিক করা।

(৬) কেবলমাত্র দ্বিপ্রহরে ১১টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত বিদ্যা-শিক্ষার সময় নির্দ্ধারণ না করিয়া সকাল হইতে রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত বিদ্যালয়ের কার্য্য চলিবার ব্যবস্থা থাকা। ইহাতে ব্যবসায়ীদের সন্তানগণের সুবিধা হয় এবং শিক্ষার্থীরা নিজ নিজ অবসর অনুসারে বিদ্যালয়ে যাওয়া আসা করিতে পারে।

(৭) শারীরিক উৎকর্ষ-সাধন এবং গ্রামস্থ নানাবিধ উপকার-সাধনের সুযোগ। বই পড়া এবং বিদ্যালয়ে যাওয়াই ছাত্রগণের একমাত্র কর্ত্তব্যরূপে পরিণত না হওয়া।

(৮) বিদ্যালয়ের পরিচালনাসম্বন্ধে গ্রামের সকলেরই মতামত প্রকাশ করিবার ক্ষমতা থাকা।

কিন্তু বালিকা-বিদ্যালয় এবং নৈশ বিদ্যালয় প্রভৃতি নূতন বিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠা দ্বারা শিক্ষা-গণ্ডীর যে বিস্তার সাধিত হয়, তাহার অভাবই আমাদের শিক্ষার একমাত্র অভাব নহে। যাহাদের শিক্ষালাভ হইতেছে, তাহাদের শিক্ষাও অসম্পূর্ণ ও একাঙ্গীন হইয়া থাকিতেছে। শিক্ষাপদ্ধতিতে জাতীয় ধর্ম্ম ও নীতিশিক্ষার কোন বন্দোবস্ত নাই; এবং এরূপ অবৈজ্ঞানিক ও অস্বাভাবিকভাবে শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছে যে, কোন ছাত্র হয়ত পাঠশালার নিম্নশ্রেণী হইতে কলেজের সর্ব্বোচ্চ শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়িয়াও সামান্য মাত্র ইতিহাস-শিক্ষা করিবার সুযোগ পাইল না, আবার কেহ হয়ত তৎপরিমাণ বিদ্যাশিক্ষা করিয়াও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ থাকিয়া গেল।

বর্ত্তমান শিক্ষা-পদ্ধতি সর্ব্বাঙ্গীন নহে

অধিকন্তু, যাঁহারা উচ্চতর শিক্ষালাভ করিয়া সংসারে প্রবেশ করিলেন, তাঁহাদের শিক্ষারই বা পরিচয় কোথায়? অর্দ্ধ শতাব্দী পর্য্যন্ত এই সমাজে উচ্চশিক্ষার প্রভাব কার্য্য করিয়াছে, কিন্তু কয়জন উচ্চশিক্ষা-প্রাপ্ত ব্যক্তি অনন্যকর্ম্মা হইয়া ইতিহাসালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, কয়জন বিজ্ঞানচর্চ্চায় মনোনিবেশ করিয়াছেন, কয়জন স্বাধীনভাবে চিন্তা করিয়া জাতীয় জ্ঞানভাণ্ডারের পুষ্টিসাধন করিয়াছেন, উচ্চ-বিদ্যাসমূহ সমাজে সহজলভ্য ও সাধারণের উপযোগী করিবার জন্য কয়জন মাতৃভাষার শ্রীবৃদ্ধিসাধনে সমগ্র জীবন নিয়োজিত করিয়াছেন, কয়জন শিক্ষিত ব্যক্তি শিক্ষাপ্রণালীর আলোচনা করিয়া শিক্ষাবিস্তার কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছেন—বেশী চিন্তা না

উচ্চ শিক্ষিত সমাজের অবস্থা

করিয়া ও এক নিঃশ্বাসে বলিয়া ফেলা যায়। আমাদের শিক্ষার অভাবের মধ্যে ইহা একটা কম অভাব নহে। কেবলমাত্র যে শিক্ষাবিস্তারের অভাব তাহা নহে, প্রকৃত উচ্চশিক্ষারও অত্যন্ত অভাব রহিয়াছে।

শিক্ষাবিষয়ক স্বতন্ত্র আন্দোলন

সুতরাং দেশে শিক্ষার অভাব নাই—অথবা অন্যে অভাব যথাসাধ্য মোচন করিয়া দিতেছে ভাবিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিবার অবসর নাই। উচ্চশিক্ষা, নিম্নশিক্ষা, স্ত্রীশিক্ষা, শিল্পশিক্ষা, লোকশিক্ষা প্রভৃতি শিক্ষার সকল বিভাগেই মহৎ অভাব উপলব্ধি করিয়া একমাত্র শিক্ষার জন্যই সমাজে এখন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে আন্দোলন করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। যত উপায়ে যতদিক্ হইতে যত বেশী লোক শিক্ষা-বিষয়ক আন্দোলনে যোগদান করিয়া শিক্ষার পুষ্টি-সাধন করিতে অগ্রসর হইবে, ততই দেশের উন্নতি হইবে। শিক্ষার দ্বারাই সমাজের নীতি, ধর্ম্ম, অর্থ প্রভৃতি সকল বিষয়েরই উৎকর্ষ সাধিত হইবে, এরূপ ভাবিয়া যাঁহারা কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবেন, তাঁহারাই দেশের স্থায়ী মঙ্গলের পথ পরিষ্কার করিয়া দিবেন।

শিক্ষাক্ষেত্রে যাঁহারা অবতীর্ণ হইয়াছেন, অথবা হইয়া অন্যের পথপ্রদর্শক হইবেন, তাঁহাদের বিশেষরূপে মনে রাখিতে হইবে যে,

দেশের অভাব মোচ-নোপযোগী শিক্ষাবিস্তার বহুকালসাপেক্ষ হইবার কারণ

শিক্ষা বিষয়টীর বিশেষত্ব এই যে, ইহার উন্নতি বহুসময়সাপেক্ষ। যাঁহারা অতি শীঘ্র ফল-লাভের আশা করেন, যাঁহারা ভবিষ্যতের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া বর্ত্তমানের সামান্য আরম্ভের মধ্যে

নিজেদের সহিষ্ণুতা ও স্থৈর্য্য রক্ষা করিতে পারেন না, তাঁহারা এই কার্য্যের যোগ্য নহেন।

বাঙ্গালা ভাষার উন্নতিসাধন দ্বারা ইহাকে সর্ব্বভাবব্যঞ্জক করিয়া শিক্ষা-পদ্ধতির সকল স্তরে প্রচলিত করা দু'এক বৎসর বা দু'এক জনের কার্য্য নহে। বাঙ্গালা সাহিত্যের উৎকর্ষ অল্প শ্রমে সাধিত হইবে না। বহু ব্যক্তির সমগ্র জীবনব্যাপী সমবেত চিন্তা ও আলোচনার ফলেই এই কার্য্য সাধিত হইতে পারে।

(১) মাতৃভাষার অসম্পূর্ণতা

শিল্প-শিক্ষার বন্দোবস্ত করিয়া উন্নত উপায়ে স্বাধীন অন্নের ব্যবস্থা করা এক পুরুষের সাধ্যাতীত। যে দেশে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে শিল্প প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, সেই দেশের কতিপয় লোক বিদেশ হইতে শিক্ষা লাভ করিয়া আসিলেই দেশে উন্নত বৈজ্ঞানিক প্রণালীর সাহায্যে কারখানা প্রতিষ্ঠা, এবং শিল্পে লাভবান্ হইবার চেষ্টা ফলবতী হইবে না। কারণ যে দুই চারিজন লোকের মধ্যে সেই বিদ্যা আবদ্ধ কেবল মাত্র তাহাদিগকেই বিশ্বাস করিয়া দেশের ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ মূলধন ব্যয় করিতে সাহসী হইতে পারেন না।

(২) স্বাধীন জীবিকার অভাব

এদিকে দেশের মধ্যে ব্যবসায় ও শিল্পের উন্নতি সাধিত না হইলে, সঙ্গে সঙ্গে শিল্প-কারখানার সংখ্যা ও সামর্থ্য বৃদ্ধি না পাইলে শিল্পশিক্ষার সুবিধা হইতেই পারে না এবং শিল্প-ও-ব্যবসায়-বিদ্যালয়ের আদর হইবে না। এই সকল কারণে শিল্প-প্রতিষ্ঠা ও শিল্প-

শিক্ষা অল্পকালের মধ্যে এ দেশে প্রকৃত অভাব-মোচনোপযোগী হইয়া ফলদান করিতে পারিবে না।

সমাজে বিজ্ঞানচর্চ্চা এবং ইতিহাসালোচনার প্রতিষ্ঠা দেখিতে হইলেও বহুকাল অপেক্ষা করিতে হইবে। যাঁহারা এ সকল বিষয়ে অগ্রগামী হইয়াছেন, তাঁহাদের তত্ত্বাবধানে উপযুক্ত এবং অধিকসংখ্যক বিদ্যানুরাগী ছাত্র অনন্যচিত্তরূপে সমবেত হইলেই প্রকৃত বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক আলোচনার যুগ উপস্থিত হইতে পারে। এই সকল ক্ষেত্রের লোকাভাব শীঘ্র যে পূর্ণ হইবে এরূপ আশা করা যায় না।

(৩) জ্ঞানানুশীলনে আন্তরিকতার অভাব

যাহা হউক, এতদুপযোগী লোকসংগ্রহ এবং কর্ম্মী সৃষ্টি করা আবশ্যক। এজন্য ধুরন্ধর ও প্রবর্ত্তকগণকে বিশেষ এক শিক্ষাপদ্ধতির ব্যবস্থা করিতে হইবে। কোন কোন দেশে সমরবিভাগে কার্য্য করিবার জন্য "কন্‌স্ক্রিপ্‌সন্‌" প্রথা প্রচলিত আছে। তাহার ফলে প্রত্যেক ব্যক্তি সামরিক জীবন গঠন করিয়া রাষ্ট্রের প্রয়োজনানুসারে কার্য্য করিতে বাধ্য হয়। আমাদের সমাজে শিক্ষাবিষয়ে সেইরূপ কোন প্রথা অবলম্বন করা যাইতে পারে কিনা ভাবিবার বিষয়। ইতিমধ্যে নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বন দ্বারা বিশেষ এক শ্রেণীর শিক্ষক ও প্রচারক প্রস্তুত করিয়া লইবার প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছে।

শিক্ষা-বিস্তারকল্পে 'কন্‌স্ক্রিপ্‌সন্‌'

যাঁহারা এই পদ্ধতি অনুসারে জীবন গঠন করিতে চাহেন, তাঁহাদিগকে সাধারণ শিক্ষার্থিগণের ন্যায় কোনও বিদ্যালয়ে যাইয়া লেখা-

শিক্ষা-প্রচারক সৃষ্টি

পড়া শিখিতে হইবে না। তাঁহাদিগের জন্ত নানা কর্ম্মক্ষেত্রে উপযুক্ত ব্যক্তিগণের নানা ভাবে শিষ্যত্ব-গ্রহণের ব্যবস্থা করিয়া দিতে হইবে। বিবিধ কার্য্যে যোগদান এবং বিচিত্র কার্য্যাধ্যক্ষগণকে সাহায্য করিয়া তাঁহাদের শিক্ষা লাভ হইবে। অবশ্য এইরূপ কার্য্য করিবার সময়েই অবসর-মত যথোচিত গ্রন্থাদি পাঠও করিতে হইবে।

যে সমুদয় কর্ম্মে সহায়তা করিয়া বিস্তার্জ্জন করিতে হইবে,নিম্নে তাহার একটি তালিকা প্রদত্ত হইতেছে—

১। ল্যাবরেটরী ও বিজ্ঞানগৃহের কেরাণী, য়্যাসিষ্টাণ্ট, ডিমন্‌ষ্ট্রেটর, হিসাবরক্ষক প্রভৃতির কার্য্য

২। বিবিধ কারখানার ঐরূপ কার্য্য

৩। উন্নত লেখক, গ্রন্থকার, সংবাদপত্রের সম্পাদক, ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানকারী,প্রত্নতত্ত্ববিৎ প্রভৃতির সহায়তা-কারীর কার্য্য

৪। অনুবাদ, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবন্ধলিখন, গ্রন্থাদির সারাংশ-সঙ্কলন, রিপোর্ট, বিবরণী-প্রকাশাদি সামান্ত ও সহজ সাহিত্য-সংক্রান্ত কার্য্য

৫। আফিস ও কার্য্যালয়ের কেরাণী, হিসাবরক্ষক, পরিচালক প্রভৃতির কার্য্য

৬। ব্যবসায়ী ও শিল্পীদিগের তত্ত্বাবধানে বিচিত্র স্থানে ভ্রমণ ও বিচিত্র তথ্যসংগ্রহ

৭। লোকহিতকর বিবিধ সদনুষ্ঠানে যোগদান

৮। নিম্ন-বিদ্যালয়, নৈশবিদ্যালয়, বালিকাবিদ্যালয় প্রভৃতিতে শিক্ষকতার কার্য্য

৯। ছাপাখানা ও গ্রন্থপ্রকাশসংক্রান্ত বিবিধ কার্য্য

প্রচারক সৃষ্টির ব্যবস্থায়

(ক) কর্ম্মজীবনের প্রাধান্য

এই রূপ বিচিত্র কার্য্যের মধ্যে থাকিয়া সকলকেই শিক্ষিত হইতে হইবে। প্রত্যেককেই সর্ব্ববিধ কার্য্যে ব্যুৎপন্ন হইয়া অভিজ্ঞতা লাভ করিতে হইবে। এই সকল কার্য্যে নানাশ্রেণীর দায়িত্ব গ্রহণ করিতে অভ্যস্ত হইতে হইবে। যাহাতে শিক্ষার্থীরা নিম্নপদ হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ উচ্চতর পদের অধিকারী হয় তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিতে হইবে। প্রত্যেকেরই সকল বিষয়ে যাহাতে বিবিদিষা জন্মে এবং সকলপ্রকার কার্য্য করিবার প্রবৃত্তি ও শক্তি বিকশিত হয়, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সকলের মধ্যে এই কার্য্যগুলির বিভাগ ও পরিবর্ত্তন সাধন করিতে হইবে।

(খ) গ্রন্থপাঠ

তাহাদিগকে ল্যাবরেটরী, লাইব্রেরী, ফ্যাক্টরী, কারখানা, ছাপাখানা, আফিস, বিদ্যালয় প্রভৃতি কর্ম্মকেন্দ্রে বিবিধ কার্য্য করিতে করিতেই মানসিক উৎকর্ষসাধনোপযোগী গ্রন্থপাঠও করিতে হইবে। এজন্য উপযুক্ত অধ্যাপকের তত্ত্বাবধানে অল্প কালের মধ্যে যাহাতে তাহাদের বহু পরিমাণ শিক্ষালাভ হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে; এবং বিভিন্ন কর্ম্মক্ষেত্রে প্রেরণ করিবার সময়ে যথোচিত পুস্তক ও ল্যাবরেটরীর সাজ সরঞ্জমাদি প্রদান করিতে হইবে। এইরূপে যে সমুদয় বিষয় শিক্ষা করিতে হইবে নিম্নে তাহার তালিকা প্রদত্ত হইতেছে—

১। সংস্কৃত সাহিত্য
২। ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষার গণিত
৩। পদার্থ-বিজ্ঞান ও রসায়ন
৪। উদ্ভিদ্-বিজ্ঞান ও প্রাণী-বিজ্ঞান
৫। অঙ্কন ও চিত্রবিদ্যা
৬। প্রাচীন গ্রীস ও রোমের ইতিহাস
৭। প্রাথমিক ধনবিজ্ঞান
৮। কয়েকটি দেশের রাষ্ট্রশাসনপ্রণালী
৯। ইংরাজী সাহিত্য ও তাহার ইতিহাস

এই সকল বিষয়ে অত্যচ্চ বা গভীর জ্ঞানের প্রয়োজন নাই, ইণ্টারমিডিয়েট মানের কিঞ্চিৎ উর্দ্ধ এবং বি, এ, পরীক্ষার কিঞ্চিৎ ন্যূন পরিমাণ জ্ঞান লাভ হইলেই যথেষ্ট।

চারি বৎসর কাল এই ভাবে কার্য্য ও গ্রন্থপাঠ করিতে হইবে। কোনও বিদ্যালয়ে পরীক্ষা দিবার প্রয়োজন নাই। তাহার পর

(গ) বিদেশে জীবনযাপন

বিদেশে প্রেরণ করিয়া শিক্ষা-প্রদানের ব্যবস্থা করিতে হইবে। যাহারা ইংরাজী ভাষায় বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইতে সমর্থ হইবে তাহাদিগকে জার্ম্মাণি ও ফ্রান্সে, এবং যাহারা ইংরাজীতে বিশেষ পারদর্শী হইবে না তাহাদিগকে ইংলণ্ড ও আমেরিকায় পাঠাইতে হইবে।

বিদেশে তিন বৎসর কাল থাকিতে হইবে। সেখানেও কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে সাধারণ শিক্ষার্থীর ন্যায় শিক্ষা লাভ না করিলেও চলিতে পারে। উপযুক্ত পরিচালকের নেতৃত্বে ও তত্ত্বাবধানে লাই-

শ্রেণীতে বসিয়া অথবা গৃহেই গ্রন্থাদি পাঠ করিতে হইবে। তবে যে সকল বিষয়ে হাতে কাজ করিলে ফল ভাল হয়, সেই সকল বিষয়ের জন্য special student, external candidate অথবা apprenticeএর ন্যায় ল্যাবরেটরী, ওয়ার্কসপ প্রভৃতিতে কর্ম্ম করিলেই চলিতে পারে।

এতদ্ব্যতীত কোন কোন বিষয়ের theoretical lessons-এর জন্যই যে বিশ্ববিদ্যালয়ে লব্ধপ্রতিষ্ঠ অধ্যাপকগণ শিক্ষা-প্রদান করেন, সেই সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের উৎকৃষ্ট বক্তৃতাগুলিতে উপস্থিত থাকিয়া শিক্ষার্থীরা শিক্ষালাভ করিতে পারে এরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে।

এই তিন বৎসরের মধ্যে শিক্ষার্থীকে কোনও বিষয়ে বিশেষজ্ঞ, specialist বা expert করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতে হইবে না। যাহাতে প্রত্যেকেই সকল বিষয়ে মনোযোগ করিয়া বিদেশীয় চিন্তা ও শিক্ষাপদ্ধতির বিশিষ্ট গুণগুলি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে, কেবল তাহারই বন্দোবস্ত করিতে হইবে। তবে সেই সঙ্গে কোন একটি বিশেষ শিল্প, ব্যবসায় বা বৈজ্ঞানিক কার্য্যপ্রণালীর মূল কথাগুলি যাহাতে আয়ত্ত হয় তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া শিক্ষণীয় বিষয় নির্দ্ধারণ করা সঙ্গত। সেইসকল বিষয়ে কোনও পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ডিগ্রি লাভ করিবার বিশেষ কোন প্রয়োজন নাই।

শিক্ষাপ্রচারকের কর্ম্ম

সাত বৎসর শিক্ষালাভের ফলে কোনও এক বিষয়ে বিশেষ পাণ্ডিত্য এবং অভিজ্ঞতা জন্মিবে না। কর্ম্মক্ষেত্রের বিভিন্ন প্রয়োজন সাধনোপযোগী

সাহস ও নৈপুণ্য জন্মিবে এইরূপ আশা করা যায়। তখন হইতে এইরূপে শিক্ষাপ্রাপ্ত প্রচারকগণকে বিচিত্রস্থানে বিচিত্রকার্য্যের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে।

অল্পবেতনে উপযুক্ত কর্ম্মীরা কার্য্য করিলে বহুবিধ আন্দোলন এক সঙ্গে চলিতে পারিবে; এবং কার্য্যের ফলে কর্ম্মীর নিজেরও অভিজ্ঞতা লাভ হইবে। অধিকন্তু, সর্ব্বসাধারণের মধ্যে অনন্যকর্ম্মা ও নৈষ্ঠিক প্রচারকগণের কার্য্যাবলী প্রচারিত হইয়া কার্য্য ও চিন্তার নূতন নূতন পন্থার প্রতি সমাজের বিশ্বাস সৃষ্টি করিবে।

এই প্রণালীতে শিক্ষিত কর্ম্মিগণ দ্বিবিধ কর্ম্ম করিবেন। প্রথমতঃ তাঁহারা বিভিন্নদেশে এদেশবাসীর কর্ম্ম ও চিন্তা করিবার সুযোগ সৃষ্টির জন্য চেষ্টিত হইবেন; এবং হিন্দুসাহিত্য ও দর্শন প্রচার করিবার উদ্দেশ্যে পৃথিবীর উন্নত বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে আন্দোলন উপস্থিত করিবেন। সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি প্রধান প্রধান পণ্ডিতগণের দৃষ্টি যাহাতে আকৃষ্ট হয় তাহার চেষ্টা করিতে হইবে; এবং ভারতীয় বিদ্যা-গুলি ও আমাদের সমাজের বিবরণ যাহাতে বিভিন্নদেশীয় ছাত্র-বৃন্দের অবশ্য-পাঠ্যের মধ্যে নির্ব্বাচিত হয় তাহার আয়োজনকল্পে তত্রত্য সুধীমণ্ডলীর মধ্যে অবস্থিতি করিয়া বক্তৃতা, আলোচনা ও শিক্ষকতা করিতে হইবে।

(১) বিদেশে

দ্বিতীয়তঃ, যে সকল নূতন বিদ্যা শিক্ষা করা হইয়াছে, বিদেশবাসের ফলে যে সকল বিষয়ে অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে, এবং বিভিন্ন সভ্যদেশে দর্শন

(২) স্বদেশে

বিজ্ঞানাদি বিভাগে যে সকল উন্নত গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে, সেই সমুদয় বিষয় মাতৃভাষায় আলোচনা, অনুবাদ, সঙ্কলন ও সমালোচনা করিবার জন্য মনোযোগী হইতে হইবে।

এতদ্ব্যতীত, এদেশে যে সমুদয় ব্যবসায়, বাণিজ্য, কারখানা, বিদ্যালয়, ল্যাবরেটরী প্রভৃতি সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিক্ষা, এবং শিল্পবিষয়ক অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানের সূচনা হইয়াছে তাহাদিগকে রক্ষা ও পুষ্ট করিবার জন্য লাভালাভ নিরপেক্ষ হইয়া এবং সমাজের সহানুভূতির আশায় বসিয়া না থাকিয়া কয়েক জনকে কর্ম্ম করিতে হইবে।

জেলায় জেলায় ভ্রমণ এবং বিভিন্ন ব্যবসায়ী জাতির মধ্যে বাস করিয়া শিল্প, ব্যবসায়, বাণিজ্য প্রভৃতি ক্ষেত্রের বিভিন্ন কার্য্যকরী প্রণালীসমূহ হাতেকলমে পরীক্ষা দ্বারা দেখাইতে হইবে। এই উপায়ে সাময়িক প্রদর্শনীর ফলসমূহ স্থায়ী আকার লাভ করিবে।

অধিকন্তু, মৌলিক অনুসন্ধান, স্বাধীন গবেষণা, বিজ্ঞানালোচনা, ইতিহাসের তথ্যসঙ্কলন এবং শিল্প ও ব্যবসায়-বিষয়ক পরীক্ষা প্রভৃতি কার্য্যের জন্যই কতিপয় লোকের সম্পূর্ণ শক্তি ও সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিতে হইবে।

এই সকল বিষয় সর্ব্বদা মাসিক, সাপ্তাহিক, দৈনিক এবং অন্যান্য সংবাদপত্রে বিভিন্নভাষায় যাহাতে নিয়মিতরূপে প্রকাশিত হয় তাহার ব্যবস্থাও করিতে হইবে; এবং প্রয়োজন হইলে স্বতন্ত্র পত্রিকা, পুস্তিকা, নিবেদনপত্র ও গ্রন্থাদি প্রকাশ করিয়া লোকশিক্ষার সাহায্য করিতে হইবে।

আদর্শ শিক্ষা-পদ্ধতি

শিক্ষা-সমাজ

সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, ধর্ম্মসম্বন্ধীয় অথবা আর্থিক কোন আন্দোলন, অনুষ্ঠান বা প্রতিষ্ঠানের সহিত কোন শিক্ষা সমিতি বা বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছুমাত্র সংশ্রব থাকা উচিত নহে। শিক্ষা-বিজ্ঞানের নিয়মানুসারে ও শিক্ষাতত্ত্ববিদ্‌গণের পরিচালনায় বিদ্যাদান ও শিক্ষাবিস্তারই ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। এ জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলি ইহার উদ্দেশ্যের মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে—

বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য ও কার্য্যতালিকা

(ক) বিবিধ উপায়ে শিক্ষা বিস্তার করা,

(১) নিম্নশিক্ষাকে যথাসম্ভব অবৈতনিক করা,

(২) স্থানে স্থানে নৈশ-বিদ্যালয়, লাইব্রেরী, গ্রন্থশালা প্রভৃতি স্থাপন করা,

(৩) বালিকাদিগের শিক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা করা,

(৪) সাহিত্য, বিজ্ঞান, ঐতিহাসিক অনুসন্ধান প্রভৃতি শিক্ষা-বিষয়ক প্রবন্ধ, পত্রিকা বা পুস্তিকাদি প্রকাশ করা,

(৫) শিক্ষা সম্বন্ধীয় বিষয়ে প্রবন্ধাদি পাঠ অথবা প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার দ্বারা সমাজে বিদ্যাচর্চ্চা ও জ্ঞানানুশীলন উৎসাহিত ও বিস্তৃত করা।

(খ) শিক্ষকদিগের উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা করা—এই উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বন করিলে সুফল লাভ হইতে পারে—

(১) ইঁহাদিগকে বিভিন্ন দেশের পণ্ডিত ব্যক্তি বা সুধী-মণ্ডলী প্রভৃতি বিদ্যার জীবন্ত উৎস ও কেন্দ্রস্থানে প্রেরণ।

(২) ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান-কার্য্যের জন্য উপযুক্ত ধুরন্ধরগণের তত্ত্বাবধানে দেশের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ।

(৩) বিভিন্ন স্থানের বিদ্যালয়াদির শিক্ষাপ্রণালী ও কার্য্য-নির্ব্বাহ প্রভৃতি পরিদর্শনের দ্বারা অভিজ্ঞতা লাভের ব্যবস্থা।

(৪) বিদ্যালয়ের পুস্তকাগার ও বিজ্ঞানালয়ের উন্নতিসাধন করিয়া স্বক্ষেত্রে উন্নত চিন্তা ও গবেষণার সহায়তা বিধান।

(৫) প্রধান প্রধান পণ্ডিত ব্যক্তিগণের শুভাগমনের বন্দোবস্ত করিয়া তাঁহাদের উপদেশ ও পরামর্শ গ্রহণ।

(গ) শিক্ষকদিগের দ্বারা নিজ নিজ আলোচ্য বিষয়ে মাতৃভাষায় পুস্তক রচনা করাইয়া অধ্যাপনা কার্য্যের সুবিধান এবং জাতীয় সাহিত্য ও জ্ঞানভাণ্ডারের পুষ্টিসাধন।

মানসিক শিক্ষার পর্য্যায়

(১) কিয়ৎকাল পর্য্যন্ত প্রত্যেক ছাত্রকে সাহিত্য, বিজ্ঞান এবং শিল্প এই ত্রিবিধ বিষয়ই শিক্ষা করিতে হইবে। এই সময়ের

মধ্যে কয়েক বিষয় বর্জ্জন করিয়া অপর কয়েক বিষয় বাছিয়া লইতে দেওয়া উচিত নহে। নিম্নশিক্ষা এইরূপ সর্ব্বতোমুখী হইলেই ভিত্তি দৃঢ় ও বিস্তৃত হয়, এবং উচ্চশিক্ষা সুফল প্রদান করে।

বহু বিষয়

(২) ইহার পরে কিছুকাল পর্য্যন্ত শিক্ষার ব্যবস্থায় ছাত্রদিগের কৃতিত্ব অথবা বিশেষ অভিরুচি অনুসারে পাঠ্যের বিষয় বাছিয়া লইতে দেওয়া উচিত, কিন্তু কেবল একটি মাত্র বিষয় গ্রহণ করিতে দেওয়া সঙ্গত নহে। যে ছাত্র সাহিত্যে নিপুণ তাহাকে সাহিত্যের সংশ্লিষ্ট এবং সহায়তাকারী আরও দু'একটা বিষয় গ্রহণ করিতে হইবে। বিজ্ঞানে যাহার অভিরুচি তাহাকে ইহার সঙ্গে সঙ্গে আরও কয়েকটা বিষয় গ্রহণ করিতে হইবে।

কয়েকটি বিষয়

(৩) সর্ব্বোচ্চশ্রেণীতে কেবল মাত্র একটা বিষয় শিক্ষা করিতে হইবে। পূর্ব্বে ছাত্রেরা যে সমুদয় বিষয় গ্রহণ করিয়াছে, কলেজশ্রেণীতে তাহার মধ্য হইতে বিশেষ একটি বিষয় বাছিয়া লইয়া আলোচনা করিতে হইবে।

একমাত্র বিষয়

শিক্ষাপ্রণালী

মানুষের মন গঠনের ও বুদ্ধিবিকাশের প্রধান উপায় ছোট হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ বড় প্রশ্নের মীমাংসা করিতে চেষ্টা করা। বাধা ও কষ্ট দূর করিবার যত চেষ্টা করা যায়, মনের শক্তি এবং দৃঢ়তাও তত বাড়িয়া থাকে।

তাই লেখা পড়া সম্বন্ধে এরূপ নিয়ম হওয়া উচিত যে, বই যে পড়িতেই হইবে তাহা নহে—আলোচ্য বিষয়গুলি ভাল করিয়া বিচার করিতে পারিলেই হইল। এই প্রণালীতে যথেষ্ট স্বাধীনতা থাকে, এবং ইহাতে দুই একখানি পুস্তকের মধ্যে আবদ্ধ না থাকিয়া শিক্ষকের সাহায্যে একই বিষয় নানা উপায়ে নানা মতের ভিতর দিয়া বুঝিয়া দেখিবার সুবিধা পাওয়া যায়।

স্বাধীন আলোচনা

এই প্রণালী অবলম্বিত হইলে ইতিহাস, রাজনীতি, বিজ্ঞান, ভাষা ইত্যাদি সমস্ত বিষয়ই এক নূতন ভাবে মনে স্থান পায়; এবং নিজেও কিছু কিছু চিন্তা করিবার সুযোগ থাকে বলিয়া এইরূপ পড়ার ফল দীর্ঘকালস্থায়ী হয়। কেবল ভাব-জগতের কর্ত্তা না হইয়া বাস্তবের প্রতিও দৃষ্টি পড়ে। এইজন্য দেশবিদেশে ভ্রমণ, নানা প্রকার লোকের সঙ্গে ভাবের আদান প্রদান, বস্তু সমূহের সহিত পরিচয় ইত্যাদি নানা উপায়ে জ্ঞানকে সবল ও দৃঢ় করিবার প্রবৃত্তি হয়।

আর দুই চারি খানি বাঁধা বই না পড়িয়া জ্ঞাতব্য বিষয়টী আয়ত্ত করিতে চেষ্টা করিলে প্রধান লাভ হয়—ছাত্রেরা যখন বই পড়ে, তখন তাহারা যে পড়িতেছে কেবল এভাব থাকেনা। লেখক কি ভাবে লিখিয়াছেন—কোন্ বিষয়ের পর কোন্ বিষয়ের অবতারণা করা উচিত—কত উপায়ে কোন্ কোন্ "context"এ একই বিষয়ের অবতারণা করা যায় ইত্যাদি লেখার পদ্ধতি ও লেখকের মূল মন্ত্রগুলি

গ্রন্থ-নির্দ্দেশ-রীতি বর্জ্জন

পর্য্যন্ত স্ববশ হইয়া আসে। এ ভাব হইলে লেখা পড়িতে পড়িতে লিখিবার ইচ্ছা ও শক্তির উদ্রেক হয়। "কেবল গ্রহণই না করিয়া পরকেও কিছু দিব"—এ উচ্চ আশা মনে স্থান পায়। তখন অনুসন্ধিৎসু হইয়া জ্ঞানের অন্বেষণে ব্যাকুলভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতে প্রবৃত্তি জন্মে।

ইহার ফলে নিজেদের ইতিহাস, বিজ্ঞান, শাস্ত্র, সাহিত্য ইত্যাদি সকল বিষয়ই পরের চোখে না দেখিয়া নিজেদের চোখে কিরূপ দেখায় ইহা ভাবিতে ও কাজে পরিণত করিতে উৎসাহ হয়। তখন অপরের ভাবগুলি নিজের ভাষায় অনুবাদ করিয়া বা অপরের কথার সারাংশ অল্প কথায় নিজে লিখিয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারা যায় না। বরং কার্য্য ও ঘটনাবলী, সকল প্রকার চিন্তাস্রোত ও কর্ম্মের আন্দোলন, এবং সকল প্রকার দৃশ্য ও শ্রাব্য বস্তুর মধ্যে থাকিয়া প্রশ্নের পর প্রশ্নের দ্বারা মানব ও জড় প্রকৃতির লুক্কায়িত ভাণ্ডার হইতে অমূল্য তথ্যের আবিষ্কার করিতে প্রয়াস হয়। যথার্থ সত্য নির্ণয় করিয়া এক একটী বিজ্ঞান সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা জন্মে।

মৌখিক শিক্ষা

(ক) যথাসম্ভব পুস্তকের সাহায্য ব্যতিরেকে শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করা উচিত। অবশ্য ভাষার জন্য উপযুক্ত সময়ে কয়েকটী সাহিত্য-রস-যুক্ত পুস্তক ব্যবহার করা যাইতে পারে। তবে নিম্ন-শ্রেণীতে ভাষাসমূহের প্রধান প্রধান অঙ্গগুলির সহিত পরিচিত করিয়া দিবার জন্য পুস্তকের সাহায্য গ্রহণ করা সঙ্গত নহে। মুখে মুখে ভাষা ব্যবহার করিতে করিতে ব্যাকরণের

নিয়মগুলি আয়ত্ত করিয়া দিবার চেষ্টা করিলে ফল ভাল হয়।

ইতিহাস-বিষয়ে নিম্ন শ্রেণীতে কথকতার আকারে গল্পের ভিতর দিয়া সমগ্র ইতিহাসের স্তম্ভস্বরূপ প্রধান প্রধান ঘটনা, আন্দোলন ও মহাপুরুষদিগের কাহিনী শিখাইয়া দেওয়া উচিত, এবং উচ্চ শ্রেণীতে কেবল একটী মাত্র টেক্‌স্‌ট্‌বুকের উপর নির্ভর না করিয়া—বিবিধ পুস্তকের সার-সঙ্কলন দ্বারা শিক্ষা প্রদান করা কর্ত্তব্য।

উদ্ভিদ্‌-বিজ্ঞান, শরীর বিজ্ঞান, পদার্থ-বিজ্ঞান এবং রসায়ন-বিজ্ঞান এই চারি প্রকার বিজ্ঞানের প্রধান প্রধান বিষয়গুলি শিক্ষা দেওয়া উচিত। এজন্য আদৌ পুস্তকের ব্যবহার করিতে হইবে না। ছাত্রেরা বিজ্ঞানালয়ে পরীক্ষা করিয়া উদ্ভিদের বিভিন্ন অঙ্গ স্বয়ং নিরীক্ষণ করিবে এবং জীব-শরীরের বিভিন্ন অবয়বের নমুনা দেখিবে। তাহাদিগকে ভেক-ছাগলাদির অঙ্গচ্ছেদও করিতে হইবে। অস্থি বিদ্যা-বিষয়ক এবং জীবজগৎসম্বন্ধীয় মানচিত্র নিরীক্ষণ এবং চিত্র অঙ্কন করিয়া প্রকৃতির বিবিধ অভিব্যক্তির সহিত শিক্ষার্থিগণ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পরিচিত হইবার সুযোগ যাহাতে প্রাপ্ত হয়, তাহার ব্যবস্থা করা বিধেয়।

হাতে কলমে কাজ

সপ্তাহে কয়েক ঘণ্টা ছাত্রদিগকে চিত্র-বিদ্যা শিক্ষা করিতে হইবে। সাধারণ, বৈজ্ঞানিক ও অন্যবিধ চিত্র অঙ্কনের ব্যবস্থা প্রয়োজনীয়। এতদ্ব্যতীত সূত্রধর এবং তন্তুবায়ের কর্ম্ম শিক্ষা করিলে হস্ত চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের নৈপুণ্য জন্মিবার পক্ষে সুবিধা হয়।

শিক্ষায় বহুমুখীনতা আবশ্যক

(খ) শিক্ষা-প্রণালীর গুণে শিক্ষণীয় বিষয়সমূহের বাহুল্যে কোন অনিষ্ট সাধিত হয় না। বরং বিষয়গুলি পরস্পর সম্বদ্ধ বলিয়া উপকারই হইয়া থাকে।

সময়-বিভাগ এমন ভাবে নির্দ্ধারিত করা উচিত যাহাতে ছাত্রেরা অতি সহজেই বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে মনোনিবেশ করিতে পারে।

ভ্রমণ, অঙ্কন, কথোপকথনজনিত আনন্দ

দৈনিক শিক্ষার জন্য সময় ব্যয় কিছু অধিক হইলেও শিক্ষার্থীদের মানসিক শৈথিল্য জন্মে না। বিজ্ঞান-গৃহে বস্তুপরীক্ষা অথবা কারখানায় সমবেত হইয়া কর্ম্ম, চিত্রাঙ্কণে মনোনিবেশ, এবং ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক তথ্যপূর্ণ স্থানে ভ্রমণ অথবা তাহাদের বিবরণ শ্রবণ প্রভৃতি আমোদ-জনক বিষয় যদি শিক্ষা-ব্যাপারের প্রধান অঙ্গ হয়, তাহা হইলে গণিত এবং সাহিত্য-শিক্ষার সময়ে ছাত্রদিগের অবসাদ বা শিরঃপীড়া উপস্থিত হয় না।

শিক্ষণীয় বিষয়ের সংখ্যাধিক্য হইলেও ছাত্রদিগের পক্ষে শিক্ষা-পদ্ধতি আনন্দদায়ক ও প্রীতিকর বোধ হইতে থাকে। পুস্তকের

গ্রন্থের অল্পতা

ভারে আক্রান্ত থাকিতে হয় না এবং মুখস্থ করিবার প্রয়োজন হয় না বলিয়া তাহারা বিদ্যাভ্যাসে বিশেষ ক্লেশ বোধ করে না।

বিদ্যারম্ভের কাল হইতেই বয়স ও ধারণার উপযোগী প্রাকৃতিক বিজ্ঞান-শিক্ষার ফলে বাহ্যজগতের প্রকৃতি ও পরিবর্ত্তনগুলি নিরীক্ষণ করিতে করিতে জ্ঞানেন্দ্রিয় সমূহের সম্যক্ অনুশীলন হইতে থাকে। মুদ্রিত পুস্তক আয়ত্তের পরিবর্ত্তে প্রকৃতি-গ্রন্থপাঠ এবং বিজ্ঞানাগারে

পদার্থসমূহের গুণ-বিচার ও কৌতুকোদ্দীপক পরীক্ষার ফলে চিত্তের স্ফূর্ত্তি জন্মে।

প্রধানতঃ মাতৃভাষার সাহায্যে নিম্নশ্রেণী হইতে সর্ব্বোচ্চশ্রেণী পর্য্যন্ত শিক্ষা প্রদান করিলে শিক্ষা দুরূহ না হইয়া সহজ হয়; এবং যাহা শিক্ষা করা যায় তাহা কেবল বাক্য ও ভাষাগতই থাকে না, ভাব ও বস্তুগত এবং জীবন্ত হইয়া প্রকৃত বাস্তব জীবনের বিবিধ অভাবমোচনে সাহায্য করে। অধিকন্তু, শিক্ষা অল্পায়াস-ও অল্পসময়-, সুতরাং অল্পব্যয়-সাধ্য হয়।

মাতৃভাষায় সৌকর্য্য

(গ) প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতির নিয়মানুসারে শিক্ষার্থীরা বৎসরান্তে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিলেই গৌরব প্রাপ্ত হয়। বৎসরের প্রতি দিন বিদ্যাভ্যাসে মনোযোগী না হইলেও ছাত্রদিগের কোন অসুবিধা ভোগ করিতে হয় না। এই রীতি বর্জ্জন করা উচিত।

যাহাতে ছাত্রেরা প্রতিদিনই প্রতিদিনকার পাঠ সমাধা করিয়া ফেলিতে পারে তাহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি নিক্ষেপ করা কর্ত্তব্য। ছাত্রদিগকে দৈনিক কার্য্যে মনোযোগী হইতে বিশেষ উৎসাহিত করিয়া তাহাদের চরিত্রের মধ্যে বিদ্যাচর্চ্চার অভ্যাস ও স্থির জ্ঞান-পিপাসা সৃষ্টি করিবার জন্য দৈনিক পরীক্ষাগ্রহণের ব্যবস্থা করা আবশ্যক।

দৈনিক পরীক্ষাপদ্ধতি

প্রতিদিন ছাত্রদিগের পাঠের ফল নির্দ্ধারণ করিয়া একটি পুস্তকে লিখিয়া রাখা উচিত। বৎসরান্তে এই দৈনিক পরীক্ষার ফলসমূহ যোগ করিয়া বাৎসরিক পরীক্ষার সহিত মিলাইয়া দেওয়া

যাইতে পারে। সুতরাং বৎসরান্তে ছাত্রদিগের উচ্চতর শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইবার সময় উচ্চ-নীচ স্থান কেবল মাত্র ৩। ৪ দিনের ক্রমাগত কয়েক ঘণ্টা করিয়া পরীক্ষা গ্রহণের দ্বারা নির্দ্ধারিত না হইয়া বৎসরের সমগ্র কার্য্য-ফলের উপর নির্ভর করে।

প্রতি বৎসরে বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের মধ্যে বাৎসরিক ফলানুসারে পারিতোষিক বিতরণ করা হয়। যে নূতন প্রণালী বিবৃত হইয়াছে তদনুসারে ফল নিরূপিত হইলে অনেক সময়ে শেষ বাৎসরিক পরীক্ষায় যে ছাত্রেরা উচ্চস্থান অধিকার করে, তাহারাই সর্ব্বোচ্চ পারিতোষিকের অধিকারী হয় না। শেষ পরীক্ষায় নিম্নস্থান অধিকার করিয়াও যদি কোন ছাত্রের সমগ্র বৎসরের কার্য্যফল সন্তোষজনক হয়, তাহা হইলেও তাহাকে উচ্চ প্রশংসা প্রাপ্ত হইবার অধিকার দেওয়া উচিত।

এই পদ্ধতিতে শিক্ষকেরাই পরীক্ষক ভাবে সমাজে গৌরব ও মর্য্যাদা লাভ করিতে থাকেন। যাঁহারা বিদ্যা দান করিতেছেন, তাঁহারাই শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ জীবনের নিয়ন্তা এবং ভাগ্যগঠনের কর্ত্তা হইবার সুযোগ প্রাপ্ত হন। ইহাতে ডিপ্লোমা, সার্টিফিকেট, প্রশংসাপত্র, ডিগ্রি অথবা অন্য কোনও সম্মান-বিজ্ঞাপক লিপি-প্রদানের যথার্থ মূল্য নির্দ্ধারিত হইতে পারে; এবং বিশ্ববিদ্যালয় কেবলমাত্র পরীক্ষামন্দির না থাকিয়া প্রকৃত পাঠশালা ও শিক্ষালয়রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৃতি পরিবর্ত্তন

(ঘ) সাধারণ শিক্ষাপদ্ধতির নিয়মে অভিভাবকেরা ছাত্রদিগের

মানসিক উৎকর্ষের পরিচয় পাইবার সুযোগ প্রাপ্ত হন না। বৎসরান্তে সন্তানদিগের উচ্চশ্রেণীতে উঠিবার কৃতকার্য্যতা বা অকৃতকার্য্যতা দেখিয়া যৎকিঞ্চিৎ ধারণা করিতে পারেন মাত্র। কিন্তু অভিভাবকদিগকে ছাত্রগণের শিক্ষার ফল জানাইবার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা উচিত। দৈনিক পরীক্ষার ফলসমূহ প্রতিমাসের শেষে অভিভাবকগণের নিকট একখানি মুদ্রিত বিজ্ঞাপন-পত্রে প্রেরণ করা কর্ত্তব্য।

অভিভাবক ও শিক্ষালয়

বিদ্যালয়ের অধীনে ছাত্রদিগের একটী আলোচনা-সভা থাকিলে উপকার হয়। সপ্তাহে কয়েকবার বিদ্যালয়ের অবকাশকালে সম্মিলনীর অধিবেশন হইতে পারে। শিক্ষকগণও ঐ সভায় উপস্থিত থাকিবেন। ছাত্রেরা ইতিহাস, বিজ্ঞান বা নীতিসম্বন্ধীয় কোন নির্দ্দিষ্ট বিষয়ে স্বচিন্তিত প্রবন্ধ পাঠ করিবে এবং শিক্ষকগণের এই বিষয়ে ছাত্রদিগকে মৌখিক বা লিখিত উপদেশ প্রদান করিতে হইবে।

শিক্ষক-ও ছাত্র-সম্মিলন

এই প্রবন্ধসমূহ সংগ্রহ কারণে বিদ্যালয়ের অধীনে পাক্ষিক বা মাসিকপত্র চলিতে পারে। এতদ্ব্যতীত এই সমিতির অধিবেশনে বিদ্যালয়ের পুরাতন ছাত্রেরাও যোগদান করিয়া নিজ পাঠদ্দশার সূত্র বৃদ্ধি করিবার সুবিধা প্রাপ্ত হইতে পারে। ইহাতে বিদ্যালয়ের সঙ্গে প্রত্যেক ছাত্রের জীবনব্যাপী সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারে। বাস্তবিক ইহার ফলে বিদ্যালয়ই যে শিক্ষার্থীর ভাগ্য গঠনের কর্ত্তা,

পুরাতন ছাত্র

এবং বিদ্যালয়ের চতুঃসীমা ত্যাগ করিলেই শিক্ষার্থীর বিদ্যাচর্চ্চা শেষ হয় না, এই ধারণা সমাজে বদ্ধমূল হইতে পারে।

নৈতিক শিক্ষা

চরিত্রগঠনের ব্যবস্থা করিতে হইলে ছাত্রকে ত্যাগের পথে চলিতে শিক্ষা দিতে হইবে। যে যে কাজে কিছু ক্ষতিস্বীকার করিতে হয়, যে সমাজে থাকিলে পরের জন্য একটু একটু খাটিবার অভ্যাস জন্মে, যেখানে পরোপকার করিবার সুবিধা আছে, শিক্ষার্থীকে সেই সকল বেষ্টনীতেই থাকিতে হইবে।

প্রাচীন ভারতে শিক্ষা

পূর্ব্বে আমাদের দেশে যে শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল, তাহাতে ছাত্রকে গুরুগৃহে বাস করিতে হইত। তাহার ফলে ব্রহ্মচারীরা কেবল শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত বা নৈয়ায়িক হইয়া বাহির হইতেন না—সেখানে সংযম, শৌচ, কর্ত্তব্য-পালন ও কর্ম্মনিষ্ঠা ইত্যাদি সকল প্রকার মানুষোচিত গুণলাভের সঙ্গে শরীর বলিষ্ঠ ও কর্ম্মঠ হইয়া উঠিত। গুরুগৃহের হাওয়াতেই অহঙ্কারনাশ, ভক্তিশ্রদ্ধা ইত্যাদি নৈতিক জীবনের প্রধান প্রধান বীজ থাকিত।

স্বার্থত্যাগ শিক্ষাপ্রদানোপযোগী কর্ম্মকেন্দ্র

আমাদের আজকালকার অবস্থায়ও ছাত্রদিগের জন্য এই সংযম-পালন ও পরার্থে জীবনযাপনের সুবিধা করিয়া না দিতে পারিলে বিদ্যাশিক্ষার ভিত্তিই গঠিত হইবে না। তাই পাঠশালাতেই সমাজের বিবিধ কাজের প্রতি মন যাহাতে আকৃষ্ট হয়—সমাজের বিভিন্ন প্রকার অভাবমোচনের

ছোট ছোট আয়োজন যাহাতে শিক্ষার্থিগণ নিজেরাই করিতে পারে; এরূপ মনুষ্যত্ব-গঠনোপযোগী ক্ষেত্র ও সুযোগ সৃষ্টি করিয়া দিতে হইবে। নিঃস্বার্থ কাজই নৈতিক জীবন-গঠনের প্রধান উপকরণ এবং ধর্ম্মজীবনের অবলম্বন।

গৃহস্থের জীবন

মানুষকে সংসারে প্রবেশ করিয়া পরিবার-পালন, পরোপকার, ধর্ম্মচিন্তা, সন্তানসন্ততির বিবাহাদি, ভিক্ষুককে অন্নদান, রোগীর শুশ্রূষা ইত্যাদি অনেক প্রকার কাজ করিতে হয়। অর্থ-রোজগারই একমাত্র কর্ত্তব্য থাকে না। মানুষ কেবল ভোগীই নয়। অনেক সময় ইচ্ছায় হ'ক অনিচ্ছায় হ'ক তাহাকে ত্যাগস্বীকারও করিতে হয়। আবার ধর্ম্মই তাহার একমাত্র কর্ম্ম থাকে না। বৈষয়িক ব্যাপারেও মানুষ মনোনিবেশ করিতে বাধ্য হয়। তাহার মনুষত্ব কেবল শরীর বা কেবল আত্মা লইয়া নহে—সেজন্য একমাত্র উদরান্নের চিন্তা বা কেবল ধর্ম্মচর্চ্চাই জীবনের ব্রত হইতে পারে না। সমাজের সাধারণ মানুষকে সকল প্রকার কাজই করিতে হয়।

ছাত্র-জীবনের কর্ত্তব্য

অতএব যে বয়সে সেই ভাবী জীবনের জন্য প্রস্তুত হওয়া যাইতেছে, তখন হইতেই এই সর্ব্বতোমুখী কর্ম্মের দিকে লক্ষ্য করিতে হইবে। মানুষ যদি কেবল একপ্রস্থ কাপড় বা একথালা ভাত বা কেবল জপমন্ত্র হইত, তবে পঠদ্দশায় কেবল টাকাকড়ির বিদ্যা বা ধর্ম্মশাস্ত্র পড়িলেই চলিত। কিন্তু মানুষ নানাপ্রকার ইন্দ্রিয়ের ও প্রবৃত্তির সমবায়ে সৃষ্ট, তাই সকলকেই চরিতার্থ করিতে হয়। সেজন্য শিক্ষার

উদ্দেশ্য কেবল অর্থসংগ্রহই হইতে পারে না। মানুষকে ভবিষ্যতে সামাজিক, পারিবারিক, ধর্ম্মবিষয়ক, আর্থিক ইত্যাদি যত প্রকার কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইবে—ছাত্রাবস্থায় প্রত্যেকটীরই সাধনা হইলে শিক্ষাপদ্ধতিকে সম্পূর্ণ বলা যাইতে পারে।

ভবিষ্যৎজীবনের সঙ্গে সম্পর্ক থাকে এরূপ শিক্ষা লাভ হইলে ছাত্র ও অভিভাবকগণ প্রথম হইতেই নিজ নিজ পথ বাছিয়া লইতে সমর্থ হয়। তাহা না হইলে "এখন লেখাপড়া আরম্ভ ত করা যাক্" এই ভাবিয়া লক্ষ্যহীনভাবে বিদ্যারম্ভ করা হয় এবং অন্যের অভিপ্রায় মত শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া পরে দেখা যায় যে—না হইল শিক্ষালাভ, না স্বার্থসিদ্ধি।

কিন্তু আদর্শ স্থির করিয়া দিলে ভবিষ্যতে একেবারে অধীর হইয়া পড়িতে হয় না। পরীক্ষার ফলাফলে জীবন সার্থক বা নিষ্ফল মনে হয় না। দুটা একটা 'পাশে' বেশী যায় আসে না। কারণ তখন জানা থাকে যে, যাই ফল হ'ক না, সাধ্য অনুসারে চেষ্টা ত করা গিয়াছে, এখন শক্তি থাক বা না থাক জীবনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সিদ্ধ করিতে চেষ্টা করা যাইবে।

বিদ্যালয়ের শাসন

বিদ্যালয় স্থানীয় সকলেরই সাধারণ সম্পত্তি হওয়া উচিত, এবং সকলেরই পরিচিত ও সম্মানিত ব্যক্তিগণগঠিত সমিতির হস্তে ইহার পরিচালনা ও শাসনভার ন্যস্ত থাকা সঙ্গত। তাহা হইলে সকলেই ইহার উন্নতিবিধানে

পরিচালনা-সমিতি

যত্ন করিতে সুযোগ প্রাপ্ত হন। সকল বিষয়েই অভিভাবকগণ, জনসাধারণ এবং শিক্ষকেরা সম্মিলিত হইয়া কার্য্য করিতে পারেন। এই উপায়ে ইহার ভবিষ্যতের জন্য সকলেই নিজ নিজ দায়িত্ব উপলব্ধি করিতে সমর্থ হন।

বিদ্যালয়ের কার্য্যনির্ব্বাহ, আয়ব্যয়, বিধিব্যবস্থা প্রভৃতি সকল বিষয়েই কর্ত্তৃপক্ষ এবং অভিভাবকগণের মধ্যে সহযোগিতা থাকিলে পরস্পর পরস্পরের অনুকূল ও সহায় হইতে পারেন। ফলতঃ বিদ্যালয় সুশাসিত এবং ছাত্রগণ সুনিয়ন্ত্রিত হইতে পারে।

শিক্ষক ও অভিভাবকের সম্বন্ধ

যদি ছাত্র ও শিক্ষকদিগের একত্র বাসের ব্যবস্থা না থাকে, তাহা হইলে ছাত্রদিগের সর্ব্বাঙ্গীন উৎকর্ষ বিধান করিতে হইলে কর্ত্তৃপক্ষকে অনেক বিষয়ে অভিভাবকদিগের সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে। এজন্য ছাত্রদিগের গৃহের চরিত্র ও পাঠাভ্যাস এবং গুরুজনের প্রতি আচরণাদি সম্বন্ধে অভিভাবকগণের হস্তে সম্পূর্ণ দায়িত্ব অর্পণ করা উচিত। এ সকল বিষয়ে শিক্ষকদিগের শাসন অথবা বিদ্যালয়ের বিধান বিশেষ ফলপ্রদ হইতে পারে না।

কিন্তু যে সকল ছাত্র বিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসে শিক্ষকদিগের তত্ত্বাবধানে বাস করে, তাহাদের চরিত্রের জন্য বিদ্যালয় দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারে।

সাধারণতঃ ছাত্রদিগের চরিত্র ও শাসন সম্বন্ধে অভিভাবকগণের নিম্নলিখিত নিয়ম পালন করা উচিত—

(ক) তত্ত্বাবধানস্থ কোন ছাত্রকে বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করিবার সময়ে

অভিভাবককে স্বহস্তে লিখিত অনুমতি পত্র প্রদান করিতে হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে ছাত্র পূর্ব্বে কোন বিদ্যালয়ে পড়িত কি না,—পড়িলে সেই বিদ্যালয়ের বেতনাদি সমস্ত প্রাপ্য দেওয়া হইয়াছে কি না, এবং সেই বিদ্যালয়ে তাহার কিরূপ আচরণ ছিল• ইত্যাদি বিষয়ের সার্টিফিকেট প্রদান করা কর্ত্তব্য।

(খ) বিদ্যালয়ের অবকাশকালে ছাত্রেরা গৃহে কিরূপ আচরণ করে, অবকাশের পর বিদ্যালয় খুলিবার সময়ে অভিভাবকদিগের তদ্বিষয়ে মন্তব্য প্রকাশ করিয়া কর্তৃপক্ষকে জ্ঞাপন করা কর্ত্তব্য।

(গ) স্থানীয় লোকহিতকর কোন কার্য্যে যোগদান করিতে হইলে, অথবা বিদ্যালয়ের উন্নতিকল্পে কোন কার্য্য করিবার জন্য অথবা গ্রামান্তরে যাইয়া শিক্ষাপ্রচার বা অর্থসংগ্রহ করিবার জন্য অভিভাবকগণের অনুমতি গ্রহণ কর্ত্তৃপক্ষগণের কর্ত্তব্য।

(ঘ) প্রতিমাসে অভিভাবকগণের নিকট ছাত্রদিগের যে দৈনিক পরীক্ষার ফল-বিজ্ঞাপনপত্র প্রেরিত হয় তাঁহাদিগের সেই ফল-বিজ্ঞাপনপত্রে গৃহের চরিত্র সম্বন্ধে মন্তব্য লিখিয়া কর্তৃপক্ষকে তাহা পাঠান উচিত।

অধ্যাপক

অধ্যাপকগণের একাধারে অনেক গুণ থাকা আবশ্যক। কেবল মাত্র পাঁচ ঘণ্টা স্কুলে কয়েকটী বই এর অর্থ করিয়া ছাত্রগণকে মুখস্থ করাইয়া দিতে পারিলেই অধ্যাপকদের কর্ত্তব্য শেষ হয় না।

অধ্যাপকের গুণ
(১) শিক্ষক

ইঁহাদিগকে প্রথমতঃ ঐতিহাসিক বা বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান

এবং সাহিত্য-সমালোচনা প্রভৃতি বিশেষ কোন এক শাস্ত্রানুশীলনে রত থাকিয়া প্রকৃত পণ্ডিতভাবে সত্য আবিষ্কারের জন্য বিদ্যাচর্চ্চায় জীবন অতিবাহিত করিতে হইবে। তেমনি অপর দিকে সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যালয়ের পরিচালনাবিষয়ক সকল প্রকার কর্ম্ম, ছাত্রগণের চরিত্র গঠন, তাহাদের মধ্যে শৃঙ্খলা আনয়ন, সাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার, বিদ্যালয়ের পরিদর্শন প্রভৃতি বিবিধ শাসনকার্য্য করাও তাঁহাদের কর্ত্তব্যের মধ্যে পরিগণিত।

(২) বিশেষজ্ঞ

(৩) ধুরন্ধর

তৃতীয়তঃ শিক্ষার্থীর বয়স ও প্রবৃত্তির বিকাশানুযায়ী কখন কোন্ বিদ্যা আলোচিত হওয়া যুক্তিসঙ্গত, তাহাকে কোন্ কোন্ বিষয় এবং কত বয়সে কোন্ বিষয়ের কত অংশ শিক্ষা দেওয়া উচিত এই সমুদয় শিক্ষাবিজ্ঞান-সম্বন্ধীয় বিষয়ে উপযুক্ত জ্ঞান লাভ করিবার জন্য সকল শাস্ত্র এবং সকল বিদ্যার প্রতি অনুরাগী থাকিয়া অধ্যাপকদিগকে প্রকৃত "এডুকেশনিষ্ট" বা শিক্ষাতত্ত্বজ্ঞের মর্য্যাদা লাভ করিতে হইবে।

(৪) শিক্ষাতত্ত্বজ্ঞ

পুস্তকের সাহায্য না লইয়া অধিকাংশ শিক্ষা প্রদান করিতে হইলে শিক্ষকদিগকে বিবিধ পুস্তকাদির সার-সংগ্রহ করিয়া স্বাধীনভাবে শিক্ষণীয় বিষয়ের পাঠ প্রস্তুত করিতে হয়। ইঁহারা এই সকল বিষয় শৃঙ্খলীকৃত করিয়া পুস্তকাকারে লিখিতে বাধ্য হন।

(৫) গ্রন্থকার

এতদ্ব্যতীত, বিদ্যাদানই ধর্ম্ম মনে করিয়া যাঁহারা শিক্ষাবিস্তার কার্য্য জীবনের ব্রতস্বরূপ গ্রহণ করিতে পারেন না, তাঁহাদিগের দ্বারা শিক্ষাবিভাগের কার্য্য সুচারুরূপে চলিতে পারে না। কিন্তু সেরূপ শিক্ষক অতি বিরল।

এই সকল কারণে প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ে নিজেদের কার্য্যোপযোগী শিক্ষক তৈয়ারী করিয়া লইবার ব্যবস্থা থাকা উচিত। এই উদ্দেশ্যে যে সকল ছাত্রেরা কলেজের উন্নত শ্রেণীতে পড়িতেছে এবং বিদ্যাদান-কার্য্যে যাহাদের প্রকৃত প্রবৃত্তি আছে, এরূপ শিক্ষানুরাগী অধ্যয়নশীল ছাত্রদিগকে অধ্যাপনাকার্য্যে নিযুক্ত করিলে ভবিষ্যতে সুফললাভ হইতে পারে। অবশ্য সেই ছাত্র-শিক্ষকগণের উচ্চতর শিক্ষার ভারগ্রহণও বিদ্যালয়ের পরিচালকগণের কর্ত্তব্য।

অধ্যাপকগণের শিক্ষা

শিক্ষার্থীদের কথঞ্চিৎ মানসিক উৎকর্ষ সাধিত হইবার পর সম্পূর্ণ স্বাধীনতার সহিত যুগপৎ অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা কার্য্য সম্পন্ন হইবার ব্যবস্থা থাকা বাঞ্ছনীয়। তাহা হইলে জ্ঞানানুশীলনে উন্নতি সাধিত হয়। কারণ শিক্ষকতাকার্য্যে বিদ্যালয়ের পরিচালনা ও শিক্ষাপ্রণালী প্রভৃতি শিক্ষাপদ্ধতিসম্বন্ধীয় বিষয়সমূহে অভিজ্ঞতা জন্মে, স্বাধীনভাবে কর্ম্মকেন্দ্র গড়িয়া তুলিবার, দায়িত্বগ্রহণে সাহস হয় এবং ক্রমশঃ নিজ নিজ বিশেষ আলোচ্য বিষয় বাছিয়া লইয়া কেবলমাত্র সেই বিষয়েই সম্পূর্ণ মনোযোগী হইবার সুযোগ পাওয়া যায়। অধিকন্তু, প্রয়োগের ক্ষেত্র পাইয়া পূর্ব্বোপার্জ্জিত

যুগপৎ অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার আবশ্যকতা

জ্ঞান অনেক বিষয়ে সম্পূর্ণতা লাভ করে, এবং সরস ও বদ্ধমূল হয়। এতদ্ব্যতীত, সকল বিষয়েই স্বাধীন চিন্তাশক্তির বিকাশ সাধিত হইতে থাকে এবং শিক্ষাপ্রচাররূপ লোকহিতকর কার্য্যে যোগদানের ফলে পঠদ্দশাতেই প্রকৃত নৈতিক চরিত্র গঠনের সূত্রপাত হয়।

বিদ্যালয়ে ধর্ম্মশিক্ষা*

প্রায় দুই পুরুষ কাল ইংরাজী ধরণের বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাবে ভারতবাসী শিক্ষিত ও দীক্ষিত হইয়া আসিতেছেন। এই শিক্ষা-
ধর্ম্মশিক্ষার আয়োজনের প্রণালীর একটা অসম্পূর্ণতার দিকেও প্রথম
জন্য আকাঙ্ক্ষা হইতেই সকলের দৃষ্টি পড়িয়াছে। সেটা বিদ্যা-
চর্চ্চায় ধর্ম্মশিক্ষার অভাব।

দেশীয় লোকেরা অল্পকালের মধ্যেই দেখিলেন, সমাজে ভক্তি ও প্রেমের বন্ধন চলিয়া যাইতেছে, শ্রদ্ধার সম্বন্ধ কমিয়া আসিতেছে। তাহা নিবারণের জন্য ভারতবর্ষের স্থানে স্থানে বিদ্যালয়ের বোর্ডিং-গৃহে নীতি ও ধর্ম্মগ্রন্থ পড়াইবার আয়োজন হইল, এবং ছাত্রাবাসের মধ্যে দেবালয় ও মন্দির প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চলিতে লাগিল। ক্রমশঃ রাজপুরুষেরাও ভাবিলেন—'সমাজের এইরূপ নীরব প্রতিবাদসমূহ কি একেবারেই অমূলক? শিক্ষিত সমাজে রাজদ্বেষের ভাব, নরহত্যার প্রবৃত্তির জন্য যে ধর্ম্মহীন শিক্ষাপদ্ধতিই দায়ী নয়, তাহা কে বলিতে পারে?'

ইতিমধ্যে জাতীয়-শিক্ষাপরিষৎ শিক্ষার আয়োজনে ধর্ম্মের ব্যবস্থা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন, আর এ জন্য দুইটা নূতন বিশ্ব-বিদ্যালয়ই প্রতিষ্ঠিত হইতে চলিল। এই সকল কারণে বিদ্যার

---

* চুঁচুড়া সাহিত্যসম্মিলনে পঠিত, ফাল্গুন, ১৩১৮

সঙ্গে ধর্ম্মশিক্ষা হইতে পারে কি না গবর্মেণ্টের শিক্ষাবিভাগও তাহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তাহা ছাড়া সরকারের অধীনে একটা স্বতন্ত্র 'রিসার্চ্চ ইনষ্টিটিউট' বা উচ্চ বিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠারও আয়োজন হইতেছে। সেখানে আমাদের প্রাচীন ইতিহাস, সাহিত্য ও দর্শনের আলোচনায় বিশেষরূপ উৎসাহ ও সাহায্য দেওয়া হইবে। সুতরাং আশা করা যায়, শীঘ্রই দেশে ধর্ম্মশিক্ষার ব্যবস্থা হইয়া যাইবে।

কিন্তু এই সঙ্গে আধুনিক ভারতের একটা বড় দুর্ভাগ্যের কথা মনে পড়িতেছে। আমাদের মঙ্গলের জন্য অনেক চেষ্টা হয় বটে, কিন্তু আমাদের সমাজের অভাব ও স্বভাবের সঙ্গে প্রায় কোন অনুষ্ঠানেরই যথার্থ সম্বন্ধ থাকে না! অন্যকালে বা অন্যদেশে হয় ত কোন অনুষ্ঠানে সুফল পাওয়া গিয়াছে। ভালরকম চিন্তা না করিয়াই তাহার প্রয়োগ আমাদের সমাজেও চলিতে থাকে।

আধুনিক ভারতের দুর্ভাগ্য

এখানে কোনও আইন চালাইতে হইলে বিদেশ হইতে তাহার নমুনা আনা হয়, বিদেশেই তাহার খস্‌ড়া প্রস্তুত হয়। ভারতবাসীর আর্থিক উন্নতিবিধান করিতে হইবে?—বড় বড় ফ্যাক্‌টারী ও কারখানা তৈয়ারী আরম্ভ হইল, অবাধ-বাণিজ্যনীতি প্রচলিত হইয়া গেল! নিম্নশ্রেণীকে শিক্ষা দিতে হইবে? অমনি জাতিভেদ ভাঙ্গিবার প্রয়োজন বোধ হইল, অথবা অসংখ্য ম্যাজিক-লণ্ঠন কেনা হইল! স্বাস্থ্যরক্ষা করিতে হইবে? ফুট্‌বল ডাম্বেলে বাজার ভরিয়া গেল। একতা বাড়াইতে হইবে? হিন্দু-মুসলমান

ব্রাহ্ম-খৃষ্টান এক টেবিলে থাইতে বসিয়া 'ভাই ভাই এক ঠাঁই' হইয়া গেলেন! বাস্তবিক শিক্ষাই হউক, বা রাষ্ট্রীয় ব্যাপারই হউক, সামাজিক আচার-ব্যবহারই হউক বা বৈষয়িক কাজকর্ম্ম হউক—যাহাতে উন্নতির প্রয়োজন, তাহাতেই ব্যবস্থা করা হয়—নিজেদের 'ধাত', নিজেদের গতি, নিজেদের অতীতের সম্যক্ আলোচনা না করিয়া।

এইরূপ অস্বাভাবিক ব্যবস্থার কারণ আছে। প্রায় সকল বিষয়েই আমাদের চিন্তা ও কার্য্য এবং উন্নতির প্রবর্ত্তক—আমাদের পাশ্চাত্য কর্ম্মিগণের শাসনকর্ত্তারা। তাঁহাদেরই অধ্যাপক ও প্রচারক নেতৃত্ব শিক্ষাব্যাপারে আমাদের নেতা। তাঁহাদেরই এঞ্জিনীয়র ও চিকিৎসক আমাদের আধুনিক বৈষয়িক ও ভৈষজ্য কর্ম্মে আমাদের পথপ্রদর্শক। সুতরাং তাঁহাদের পাশ্চাত্যজগতের অভিজ্ঞতা এবং স্বদেশের জাতীয়শিক্ষার প্রভাব ছাড়া তাঁহাদের নিকট আমরা আর কিছু আশা করিতেই পারি না। আর আমাদের দেশের যাঁহারা তাঁহাদের দৃষ্টান্তে, অধ্যাপনায় ও উৎসাহে কাজ করিতে আরম্ভ করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে বেশী লোক স্বাধীনভাবে চিন্তা করিয়া কর্ম্মে অগ্রসর হইতে সুযোগ পান নাই। আমরা এখনও অনুকরণের যুগেই আছি, আমাদের বিশিষ্ট চিন্তা-প্রণালী ও স্বাতন্ত্র্যবোধ বিকাশলাভ করে নাই।

বিশেষতঃ আমাদের অনেকেই কার্লাইল, হুইট্‌ম্যান, টলষ্টয় প্রভৃতি আধুনিক পাশ্চাত্য চিন্তাবীরগণের ভাবুকতা ও অতীন্দ্রিয়তায় মুগ্ধ। তাঁহারা এই আধুনিক আধ্যাত্মিকতার

সন্ধান পাইয়াই প্রাচীন হিন্দু-সভ্যতার মর্ম্মস্থল অধিকার করিয়া ফেলিয়াছেন এইরূপ তাঁহাদের ধারণা। সুতরাং এখন পর্য্যন্ত

স্বদেশীয়গণের চিত্ত-সংমোহন

আমাদের প্রকৃত জাতীয় স্বাতন্ত্র্য, আমাদের সভ্যতার মূলমন্ত্র, আমাদের সামাজিক জীবনের বৈচিত্র্য বুঝিবার জন্য কেহই চেষ্টা করিবার প্রয়োজনই বোধ করেন না। উপনিষদ্ ও গীতার দুই চারিটা শ্লোক মনে রাখিলেই হইল,—আর বৈদান্তিক উপদেশ, আত্মার অমরতা, জীবনের সাধনা প্রভৃতি আলোচনার জন্য ভাবনা কি? রুসো, ব্রাউনিং, এমার্সন, সোপেনহয়ার ঘাঁটিলেই চলিতে পারে!

আমাদের চিত্তে স্বাতন্ত্র্যবোধ এতই কমিয়া গিয়াছে যে, আমরা আমাদের চারিদিক্‌কার অনুকূল ও প্রতিকূল অবস্থা বিচার করিতে

শিক্ষার ব্যবস্থায় ধর্ম্মসমস্যার মীমাংসা

পারি না। আমাদের প্রকৃতির উপযোগী কোন অনুষ্ঠান আবিষ্কার করিয়া লওয়া আমাদের পক্ষে একপ্রকার অসম্ভব। ধর্ম্মশিক্ষার আয়োজন করিতে হইবে? অমনি পাশ্চাত্যসমাজের যুক্তিগুলি মনে পড়িয়া গেল—তাহাদের সমস্যাগুলি আমাদের সমাজে টানিয়া আনিতে আরম্ভ করিয়াছি। তাহাদের আশঙ্কাগুলিও মনের মধ্যে আধিপত্য বিস্তার করিয়া বসিয়াছে।

ইউরোপ ও আমেরিকার নেতৃবর্গ মনে করেন—বিদ্যা ও ধর্ম্ম

আশঙ্কা

পরস্পরবিরোধী। বিদ্যালয়ের গণ্ডীর মধ্যে ধর্ম্মের প্রভাব বিস্তার করিলে বিদ্যার সর্ব্বনাশ করা হয়। আবার ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠানে বিদ্যার আধিপত্য

প্রতিষ্ঠিত হইলে ধর্ম্মভাব জলাঞ্জলি দিবার জন্য প্রস্তুত হওয়া উচিত। দুয়ে কখনই মিলিতে পারে না,—বিদ্যা আলোক, ধর্ম্ম অন্ধকার। বিদ্যা যুক্তি ও তর্কের সন্তান, ধর্ম্ম শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের আশ্রিত। বিদ্যা পৃথিবীর উপর মানুষের অধিকার বাড়াইয়া দেয়, ধর্ম্ম ঈশ্বরের অবতারণা করিয়া মানুষের শক্তিকে সংযত ও সঙ্কুচিত করিয়া ফেলে। বিদ্যায় ভবিষ্যৎকে দখল করিবার প্রবৃত্তি জন্মে, ধর্ম্মে অতীতের প্রতি মমতা বাড়িতে থাকে। বিদ্যা মুক্তির উপায়, ধর্ম্ম বন্ধনের কারণ। সুতরাং আমরা 'সোণার পাথরবাটী' অথবা 'কাঁঠালের আমসত্ত্ব' বলিলে যেরূপ ধারণা করিতে পারি, পাশ্চাত্যজগতের বিচক্ষণ ব্যক্তিরা বিদ্যালয়ে ধর্ম্মশিক্ষার ব্যবস্থায় সেইরূপই এক অসম্ভব অস্বাভাবিক সংযোগের ভয়ে ত্রস্ত হন।

তাঁহাদের আর এক ভয়ের কথা—ধর্ম্ম সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ এবং বিচিত্র ধর্ম্মসম্প্রদায়। শিক্ষার ব্যবস্থায় ধর্ম্মচর্চ্চার আয়োজন করিতে হইলে দেশের কোন্ সম্প্রদায়ের, কোন্ মতবাদের প্রশ্রয় দেওয়া হইবে? দলাদলি, সংগ্রাম ও বিরোধ যে তাহা হইলে সমাজে চিরন্তন হইয়া পড়িবে। পাশ্চাত্যজগতে ধর্ম্মসংগ্রাম, ধর্ম্মনির্য্যাতন, ধর্ম্মকলহের ইতিবৃত্ত পুনরায় অভিনীত হওয়া কখনই শ্রেয়স্কর নয়। সুতরাং বিদ্যালয়ের আবেষ্টনের মধ্যে ধর্ম্মের কথা তুলিয়া রাষ্ট্রীয় অনৈক্য ও মতভেদগুলি বাড়াইয়া তুলিবার প্রয়োজন নাই।

এই কুসংস্কার ও অনৈক্য-বৃদ্ধির ভয় আমাদের নেতৃবর্গকেও

আক্রমণ করিয়াছে। কেবল তাহাই নহে। পাশ্চাত্যজগতে এই সমুদয় মীমাংসা করিবার যে কৌশল আবিষ্কৃত হইয়াছে, আমাদের দেশেও তাহারই প্রচলন হইবার উপক্রম হইয়া উঠিয়াছে। সেই সকল দেশে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধীনে একটা 'থিয়লজিক্যাল ফ্যাকল্‌টি' বা ধর্ম্মসমিতি গঠন করা হইয়া থাকে। যথাসম্ভব সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে একটা 'রফা' করিয়া কতকগুলি আইন করা হয়। ধর্ম্মশিক্ষা যাহাতে অত্যুচ্চ জ্ঞানবিজ্ঞানের নিয়মেই চলিতে পারে, যাহাতে ইহার মধ্যে সঙ্কীর্ণতা, প্রাদেশিকতা, সাম্প্রদায়িকতা প্রবেশ করিতে না পারে, তাহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি থাকে। জগতের অন্যান্য বিভাগের তথ্য আলোচনা যে উপায়ে হইয়া থাকে, তাহাই অবলম্বন করিয়া ধর্ম্মজগতের সত্যগুলিও অনুসন্ধান করিতে বিধান করা হয়। এই উপায়ে বিদ্যা ও ধর্ম্মে একটা সামঞ্জস্য সৃষ্টি করিবার প্রয়াস চলিতে থাকে। অধিকন্তু, সম্প্রদায়ভেদে ধর্ম্মমন্দির, ছাত্রাবাস বা পাঠাগারের আয়োজন হয়। আর স্থানে স্থানে মতবাদের প্রাবল্য অনুসারে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জন্য সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন বিদ্যালয়ই প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে।

মীমাংসা

অবশ্য পাশ্চাত্যসমাজের অভাব-পূরণের উপযোগী বলিয়াই এইরূপ বিচিত্র ধর্ম্মশিক্ষা-পদ্ধতি অবলম্বিত হইয়াছে। ইহাতে তাঁহাদের প্রয়োজন সিদ্ধ হইতে পারে বটে, কিন্তু এই এক বিধানের দ্বারা পৃথিবীর সকল সমাজেরই অভাব মোচিত হইবে এমন কোন কথা নাই।

পাশ্চাত্য শিক্ষানীতি সমালোচনা

মানবজীবনে ধর্ম্মের স্থান সম্বন্ধে পাশ্চাত্যগণের ধারণা বিচিত্র। তাঁহারা মনে করেন—ঈশ্বরচিন্তা, ভগবানের আরাধনা, ধর্ম্মকর্ম্ম মানুষের বিশেষ কতকগুলি কার্য্য,—অন্যান্য কর্ম্ম ও চিন্তা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তাহার মস্তিষ্কে ধর্ম্মচিন্তার জন্য একটা বিশেষ প্রকোষ্ঠ আছে, তাহার হৃদয়ে একটা বিশেষ বৃত্তি আছে, তাহার চিত্তে এ জন্য একটা স্বতন্ত্র আবেগ ও আকাঙ্ক্ষা আছে ; ধর্ম্ম অনেক কাজের এক কাজ মাত্র—জীবনের বিচিত্র বিভাগের মধ্যে একটি বিভাগ মাত্র। মানুষ ঘোড়ায় চড়িয়া শারীরিক আনন্দ উপভোগ করিল, অথবা বিদ্যালয়ে যাইয়া পদার্থবিজ্ঞানের বক্তৃতা শুনিল, কিম্বা সাহিত্যসভায় আসিয়া ভক্তিবাদ প্রচার করিল, অথবা রাষ্ট্র-সভায় আলোচনা করিয়া দেশের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত করিল, কিন্তু তাহাতে ধর্ম্মকর্ম্ম করা হয় না। তাঁহাদের বিবেচনায় ইহাতে তাহার শারীরিক বৃত্তির, মানসিক শক্তির অথবা সামাজিক প্রবৃত্তি-সমূহেরই অনুশীলন ও পুষ্টি হইল মাত্র।

তাঁহারা মনে করেন, ধর্ম্মের জন্য মানবকে অন্য কতকগুলি বৃত্তির অনুশীলন করিতে হইবে। এ জন্য তাহার কতকগুলি মতবাদ গ্রহণ করা আবশ্যক। ধর্ম্মের বিষয়ীভূত বিশিষ্ট কয়েকটি শাস্ত্র আলোচনা আবশ্যক। ধর্ম্মচিন্তা ও ধর্ম্মকর্ম্মের জন্য বিশেষ কোন সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখা আবশ্যক। ঠিক যখন সেই নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মগ্রন্থগুলি পড়া হয়, অথবা নির্দ্দিষ্ট দিনে ধর্ম্মসভায় বক্তৃতা শুনা হয়, অথবা ধর্ম্মবিষয়ক সমালোচনায় যোগদান করা হয়, কেবল তখনই মানুষের ধর্ম্মাচরণ

ধর্ম্ম মানবজীবনের বিভিন্ন বিভাগের একটি বিভাগমাত্র

করা হইল, এইরূপই তাঁহাদের ধারণা। সুতরাং সেই দিনে সেই সময়ে সেই গৃহে যাহা করা হয় হউক, তাহার সঙ্গে দিবসের অন্যান্য চিন্তা ও কর্ম্মের, জীবনের অন্যান্য বিভাগের কোনরূপ সংস্রব নাই। তাঁহারা বিবেচনা করেন, গৃহস্থের নিত্যকর্ম্ম-পদ্ধতির মধ্যে ধর্ম্মকে একটা বিশেষ মর্য্যাদা দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু সমগ্র গার্হস্থ্য জীবনে, পারিবারিক কার্য্যকলাপে, সৌজন্যশিষ্টাচারে, শিল্প ও ব্যবসায়ে, রাষ্ট্রীয় কর্ম্মে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র নীতিশাস্ত্র—অর্থনীতি, পরিবারনীতি, রাষ্ট্রনীতি—মানিলেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে। এই সকল কার্য্য ও চিন্তার ক্রমান্বয় ও পৌর্ব্বাপৌর্য্য স্থির করিবার জন্য ধর্ম্ম আলোচনা করিবার কোন প্রয়োজন নাই।

আর, বাস্তবিক ধর্ম্মশিক্ষায় তাঁহারা কতকগুলি আলোচনা, গবেষণা, গ্রন্থপাঠ, সাহিত্যচর্চ্চা মাত্র বুঝেন। থিয়লজিক্যাল ফ্যাকলটির বিধানে শিক্ষার্থিগণকে তাঁহাদের ধর্ম্মপ্রচারকদিগের জীবনী সংগ্রহ করিতে হয়। কোন্ কোন্ মহাত্মা তাঁহাদের ধর্ম্ম-ইতিহাসের স্তম্ভস্বরূপ, কবে কোথায় কিরূপভাবে কোন এক মতবাদ বা অনুষ্ঠান বিকাশ লাভ করিয়াছে, কোন্ মহাপুরুষ কি উপদেশ প্রচার করিয়া গিয়াছেন, ইত্যাদি বিষয়ের ঐতিহাসিক অনুসন্ধান করা হইয়া থাকে মাত্র।

ধর্ম্মশিক্ষা ইতিহাস-শিক্ষার এক অধ্যায়

ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠই ধর্ম্মজীবনগঠনের উপায় বিবেচনা করিলে ধর্ম্মের ইতিবৃত্তসঙ্কলনই ধর্ম্মকর্ম্ম হইয়া পড়ে। ইহাতে জাতীয় ইতিহাস অনেকটা স্পষ্ট ও বিশদ হইতে পারে, ইতিহাস-শিক্ষা কার্য্যকরী ও

সুখদায়ক হইতে পারে। ইহাতে দেশীয় ধর্ম্মের পৌর্ব্বাপৌর্য্য, জাতীয় ধর্ম্মানুষ্ঠানের বিচিত্র অঙ্গগুলি হৃদয়ের উপর বেশ প্রবলভাবে অধিকার লাভ করিতে থাকে। জাতীয়শিক্ষার সার্থকতার পক্ষে ইহা যথেষ্ট প্রয়োজনীয়, কারণ ইহাতে সমাজের ও দেশের অতীত ও বর্ত্তমান অবস্থার প্রতি শিক্ষার্থী অতি সহজ ও স্বাভাবিক ভাবেই আকৃষ্ট হইয়া পড়ে।

ধর্ম্ম-শিক্ষা দর্শন-শিক্ষার এক অঙ্গ

এইরূপ ধর্ম্ম-গ্রন্থ পাঠে আরও একটা লাভ আছে। দেশের পূর্ব্বপুরুষগণ কোন্ প্রণালীতে চিন্তা করিতেন, তাঁহাদের আচার্য্যেরা বিশ্ব, দেবতা, পূজা, মানবের ভবিষ্যৎ প্রভৃতি সম্বন্ধে কোন্ কোন্ মতবাদ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, বিভিন্ন সম্প্রদায় ও মতবাদের মধ্যে বৈচিত্র্য ও পার্থক্য কি উপায়ে সাধিত হইয়াছে, সেই মতবাদসমূহ সাহিত্যকে প্রভাবান্বিত করিয়াছে কি না, জাতীয় জীবনের অন্যান্য বিভাগের চিন্তা ও কর্ম্মসমূহ কি ভাবে তাহার ফলে রূপান্তরিত হইয়াছে—ইত্যাদি দর্শন ও সমাজতত্ত্ববিষয়ক বিবিধ প্রশ্নেরও আলোচনা করিবার সুযোগ থাকে। এই উপায়ে দেশের পূর্ব্বাপর চিন্তাসমূহ ছাত্রের মনের মধ্যে অঙ্কিত হইয়া যায়। তাহাতে দেশকে চিনিবার পক্ষে, সমাজের প্রকৃতি বুঝিবার পক্ষে ছাত্রাবস্থায়ই সুবিধা পাওয়া যায়।

তাহা ছাড়া দর্শন ও মনস্তত্ত্বের আর এক বিভাগও এই উপায়ে আয়ত্ত হইয়া আসে। বিভিন্ন ধর্ম্মের তুলনামূলক আলোচনা দ্বারা 'ধর্ম্ম-বিজ্ঞানে'র নিয়মগুলি ধরিতে পারা যায়। মানবের আদিম

ধর্ম্মভাব, মানুষের চিরন্তন ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি এবং বিচিত্র ধর্ম্মকর্ম্মের মধ্যে কি সাধারণ লক্ষণ আছে, তাহা এই ধর্ম্ম-বিজ্ঞান আলোচনার মধ্য দিয়াই স্পষ্ট হইতে থাকে।

যাহা হউক, এই প্রকার ধর্ম্ম-শিক্ষার আয়োজনে গণিত, সাহিত্য, রসায়ন প্রভৃতি অন্যান্য বিদ্যার ন্যায় ধর্ম্ম একটি বিদ্যা মাত্র। ইহাতে ধর্ম্মশিক্ষা ইতিহাস-শিক্ষারই বিশেষ এক অধ্যায়-রূপে অথবা দর্শন-শিক্ষার এক স্বতন্ত্র অধ্যায় ভাবে শিক্ষা-পদ্ধতিতে মর্য্যাদা লাভ করে, ধর্ম্ম বিশেষ একটি শিক্ষণীয় বিষয় মাত্ররূপে বিবেচিত হয়। কাজেই গণিতের 'ফ্যাকলটি', ইতিহাসের ফ্যাকলটি, চিত্রবিদ্যার ফ্যাকলটির ন্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ধর্ম্মালোচনার এক ফ্যাকলটি বা সমিতি প্রতিষ্ঠা করিলেই যথেষ্ট হয়। এই ধর্ম্ম-সমিতি বিবিধ উপদেশসংগ্রহ, ধর্ম্মতত্ত্ব-সঙ্কলন, ধর্ম্ম-গ্রন্থ-নির্ব্বাচন, ধর্ম্মচর্চ্চা-প্রণালী, ধর্ম্ম-শিক্ষার সময়-নির্দ্দেশ, ধর্ম্ম-শিক্ষক-নিয়োগ প্রভৃতি যাবতীয় উপায়ে বিধি-ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। গণিত, দর্শন প্রভৃতি বিষয়ে ছাত্রদিগকে মাসিক ও বার্ষিক পরীক্ষা করা হয়। ধর্ম্মশাস্ত্র বিষয়েও এইরূপ পরীক্ষা হইয়া থাকে। বিদ্যালয়ের মধ্যেই বিজ্ঞানালোচনার জন্য ল্যাবরেটরী আছে, শিল্পশিক্ষার জন্য ওয়ার্কসপ কারখানা আছে, পাঠের জন্য লাইব্রেরী, গ্রন্থশালা, রীডিংরুম আছে। ধর্ম্মের জন্যও সেইরূপ ডিভিনিটি গৃহ, ধর্ম্মালোচনার মন্দির ও ডিভিনিটি বিদ্যালয় নির্ম্মাণ করা হয়। পরীক্ষার ফলে, এম্, এ, পি, এইচ্ ডি, প্রভৃতির অনুরূপ, বি, ডি, ডি, ডি, উপাধি পাওয়া

ধর্ম্মবিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি স্বতন্ত্র প্রকোষ্ঠ

যায়। ধর্ম্মের এই 'ডি-ডি'গণ বক্তৃতা করিবার শিক্ষা পান, প্রবন্ধ লিখিবার শক্তি লাভ করেন, তর্ক-যুক্তি দ্বারা মতবাদ প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হন, কি উপায়ে বিভিন্ন সমাজের মধ্যে ধর্ম্ম প্রচার করিতে হয় তাহা শিখিয়া থাকেন, লোকের সঙ্গে, ছাত্রের সঙ্গে, বিভিন্ন সমাজের সঙ্গে কিরূপ আচরণ করিলে সুফল লাভ হয় ও কার্য্য সিদ্ধি হইতে পারে তাহার বিষয়েও যথেষ্ট জ্ঞান লাভ করেন।

এতদ্ব্যতীত পাশ্চাত্য ধর্ম্মশিক্ষা-পদ্ধতিতে আর একটা উপকার হয়। ছাত্র ও শিক্ষকেরা অনেকগুলি নূতন ক্ষেত্রে একত্র মিলিতে পারেন, ইহাতে তাঁহাদের সামাজিকতা ও লৌকিকতা বাড়িতে পায়, সমবেত চিন্তা ও কর্ম্ম করিবার শক্তি পুষ্ট হইতে থাকে, পরস্পরকে সহায়তা করিবার সুযোগ পাওয়া যায়। কিন্তু যাহাই হউক, এই শিক্ষা-প্রণালীতে ধর্ম্মশিক্ষা মানসিক শিক্ষারই একটি বিশেষ অঙ্গমাত্র। অন্যান্য বিদ্যা-শিক্ষার ন্যায় ধর্ম্ম-শিক্ষায়ও মস্তিষ্কেরই সঞ্চালন হয়, চিন্তা করিবারই ক্ষমতা বিকশিত হয়, দার্শনিক ও ঐতিহাসিক গবেষণার সাহায্য হয়, আর সামাজিক জীবনের পুষ্টি হয়। সেক্‌সপীয়র ও কালিদাসের কাব্য সমালোচনা করিয়া, মনুসংহিতা বা প্লেটোনীতি পাঠ করিয়া, 'পিল্‌গ্রিম্‌স্ প্রোগ্রেস' বা হিতোপদেশের ব্যাখ্যা মুখস্থ করিয়াও ছাত্রগণ এই সকল বৃত্তিরই বিকাশ সাধন করে, এই সমুদয় শক্তিরই অনুশীলন করে, এই সমুদয় বিষয়েই যোগ্যতা ও সামর্থ্য লাভ করে।

ধর্ম্মশিক্ষায় মানসিক উন্নতি-সাধন

জার্ম্মাণি, আমেরিকা এবং ইউরোপের অন্যান্য দেশের থিয়ল-

জিক্যাল ফ্যাকল্টি বা ধৰ্ম্মসমিতি-গঠন, ডিভিনিটি-মন্দির-প্রতিষ্ঠা এবং ধৰ্ম্মশিক্ষা-দানের অন্যান্য উপায়গুলি আলোচনা করিলে আর একটা বিষয় বুঝিতে পারা যায়। তাঁহাদের শিক্ষাতত্ত্বের মূল কথাটা ব্যক্ত হইয়া পড়ে।

তাঁহারা মানুষকে অতি ক্ষুদ্র ও সঙ্কীর্ণ ভাবে দেখেন। মানুষকে বড় ভাবে, মহৎ ভাবে দেখিবার প্রয়াস তাঁহাদের মধ্যে থাকে না। ইহজগৎই মানুষের সমগ্র লীলাভূমি ও কৰ্ম্মক্ষেত্র, এই জন্মেই তাহার সম্পূর্ণ বিকাশ। এই গণ্ডীর মধ্যেই তাহাকে চিন্তা করিতে হইবে, কৰ্ম্ম করিতে হইবে। ইহার অতীত, বর্ত্তমান-ব্যতিরিক্ত, শরীর-ছাড়া এবং মন-ছাড়া আর কোন জগতের অস্তিত্ব নাই। আত্মা তাঁহাদের নিকট মস্তিষ্কের একটা অলীক ধারণামাত্র, অসীমের উপলব্ধি, আধ্যাত্মিক ক্রমবিকাশ প্রভৃতি বিষয় তাঁহাদের নিকট ভাষার একটা অলঙ্কার বা উপমামাত্র। এই খানেই মানুষের শেষ, এই জীবনেই তাহার চরম সিদ্ধি।

পাশ্চাত্য মানবতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্ব

কিন্তু সমাজের মধ্যে থাকিতে হইলে সকল বিষয়েই প্রতিদিন দ্বন্দ্ব, বিরোধ, কলহ, অনৈক্য আসিয়া জুটে। তাহা নিবারণ না করিতে পারিলে সংসারের সুখ কোথায়? পৃথিবী যে দৈনিক সংগ্রামের রঙ্গভূমি হইয়া পড়িবে! কাজেই শারীরিক ও মানসিক অনৈক্যগুলি যথাসম্ভব কমাইবার চেষ্টাই পাশ্চাত্য সমাজের প্রধান লক্ষ্য। তাঁহারা ভাষা ছাঁটিয়া, বেশভূষার আইন করিয়া, চালচলনের রীতি বিধিবদ্ধ করিয়া, দলে দলে চুক্তি করাইয়া যথা-

সম্ভব বৈচিত্র্যের উচ্ছেদ সাধন করিতে চেষ্টিত হন। জীবনের কোন্ কোন্ বিভাগের মধ্যে কোনরূপ দ্বন্দ্ব হইবার সম্ভাবনা নাই, কোন্ কোন্ অংশ বাদ দিলে জোড়াতালি দিয়া একটা সামঞ্জস্য বিধান করা যায়, কোন্ কোন্ বিষয়ে একটা চলনসই সন্ধিপত্র দাঁড় করান যাইতে পারে, এই সব আবিষ্কার করাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য। পাশ্চাত্য-সমাজের অনুষ্ঠানসমূহের মধ্যে এইরূপে ঘসিয়া মাজিয়া, কাটিয়া ছাঁটিয়া, মাঝামাঝি করিয়া বিরোধ ঘুচাইবার, অনৈক্য দূরীভূত করিবার আয়োজন যথেষ্ট দেখা যায়। রাষ্ট্রসভায়, বিদ্যালয়ে, ধর্ম্মশালায় তাঁহাদের এই এক লক্ষ্য।

পাশ্চাত্য-জগতের এই বিচিত্র মানবতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্বই তাঁহাদের বিশিষ্ট শিক্ষাতত্ত্বের মূল। তাঁহারা মানুষকে অতি ক্ষুদ্র ভাবে দেখিয়াছেন, সমাজকে এই সংসারের মধ্যেই আবদ্ধ করিয়াছেন। এই জন্য বিরোধের ভয়ে তাঁহারা এত বিব্রত। এই জন্য জাগতিক একটা ঐক্য প্রতিষ্ঠা করিতে না পারিলে তাঁহারা ব্যস্ত থাকেন। এই জন্য যে সকল বিষয়ে ঐক্য প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা অল্প সেই সকল বিষয়ে তাঁহাদের সাহস বড় কম।

কিন্তু মানবকে আর একভাবে দেখা যায়। কারণ মানুষ কেবল শরীরীই নহে। অসীম অনন্ত তাহাকে ঘিরিয়া আছে। দুই অনাদ্যন্ত জগতের মধ্যে তাহার অবস্থান। আর তাহার আত্মা তাহাকে অসীমেরই এক আত্মীয় করিয়া রাখিয়াছে। সুতরাং কেবল মাত্র সসীমের কথা ভাবিলে, কেবল ইন্দ্রিয়ের বিষয় জানিলে, কেবল সংসার ও

প্রকৃত মানবতত্ত্ব

ভোগের জ্ঞান জন্মিলে সমগ্র মানবকে জানা হইল না। অতীন্দ্রিয়কে বাদ দিলে, অমরতাকে প্রত্যাখ্যান করিলে মানুষের ইতিবৃত্ত অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। কাজেই সমগ্র, সম্পূর্ণ মানবের চরম সিদ্ধি এই এক জীবনের ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে হইতে পারে না। কত শত যুগযুগান্ত লইয়া তাহার লীলা, কত শত জন্মমরণে তাহার আত্মার সম্পূর্ণ বিকাশ, তাহার হিসাব কে রাখিতে পারে? ফলতঃ ইহ-জগতের বিরোধ, অসম্পূর্ণতা ও ক্ষুদ্রত্বই মানুষকে প্রকৃত প্রস্তাবে ক্ষুদ্র ও সঙ্কীর্ণ করিয়া ফেলিতে পারে না। বৃহত্তর পূর্ণতা ও সমগ্রতার মধ্যে অসংখ্য পার্থিব সঙ্কীর্ণতাগুলির যথানির্দ্দিষ্ট স্থান আছে। ইহাতে সাময়িক অসম্পূর্ণতায়ও সামঞ্জস্যের এবং সৌষ্ঠবের হানি হয় না।

ধর্ম্মতত্ত্ব

এই বৃহত্তর সমগ্রতার সংবাদ আনিয়া দেয়—ধর্ম্ম। মানবের চরমসিদ্ধি এবং আত্মার সম্পূর্ণ বিকাশের উপায় আবিষ্কার করিয়া দেয়—ধর্ম্ম। এই উদ্দেশ্যে প্রতিদিনকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিন্তা ও সঙ্কীর্ণ কর্ম্মরাশির মধ্যে ধর্ম্ম অসীমকে, যুগযুগান্তকে প্রতিষ্ঠিত করে। এই অনন্তোপলব্ধিই জীবনের প্রকৃত সামঞ্জস্য ও সৌন্দর্য্য বিধান করে। তাহার ফলে পার্থিবজীবনের সকল বিভাগই, সংসারের সকল চিন্তা ও কর্ম্মই, ভোগের সকল অনুষ্ঠানই সেই বৃহত্তর সত্তা, সেই অতীন্দ্রিয়-জীবনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। ধর্ম্ম এই উপায়ে সসীমে অসীমের প্রতিষ্ঠা করে, ভোগে ত্যাগের প্রবর্ত্তন করে, জন্মে ও মরণে অমৃতের প্রভাব বিস্তার করে।

ধর্ম্ম সকল কর্ম্মের মধ্যে সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠা করে, জীবনের

সকল অবস্থায় অমরতার প্রবর্ত্তন করে। সুতরাং ধর্ম্ম কখনও মানবীয় কোন বিষয়কেই বর্জ্জন করিতে পারে না। এ জন্য মানবের কোন কর্ম্মই ধর্ম্ম-ব্যতিরিক্ত হইতে পারে না। জীবনের সকল চিন্তা ও কর্ম্মই ধর্ম্মনিয়ন্ত্রিত, সমগ্র জীবনই ধর্ম্মের ক্ষেত্র। মানুষ শরীরের সাহায্যে যাহা কিছু করে, যত কিছু চিন্তা করে, সকলই ধর্ম্মজীবনের বিভিন্ন অনুষ্ঠান। অন্তরিন্দ্রিয়ের দ্বারা যাহা কিছু করা যায় তাহাও ধর্ম্মেরই বিবিধ অনুষ্ঠান। এই সমুদয়ের ফলে সংসার পুষ্ট হয়, পরিবার গঠিত হয়, দেবতত্ত্ব স্পষ্ট হয়, রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয় ও শিল্পের বিকাশ হয়। সুতরাং বৈষয়িক জীবন ও রাষ্ট্রীয়জীবন, পারিবারিক জীবন ও ব্যক্তিগত জীবন সকলই ধর্ম্মজীবনের বিবিধ অভিব্যক্তিমাত্র। কেবলমাত্র ধর্ম্মগ্রন্থ-পাঠ বা দেবারাধনাই, মন্দিরপ্রতিষ্ঠা এবং ধর্ম্মসভায় বক্তৃতা করাই ধার্ম্মিকের সাধনা নহে। বিবাহ, শ্রাদ্ধ, দান, উপাসনা, পূজা, আলোচনা, ভ্রমণ, ব্যায়াম ও আচার-ব্যবহার সকলই ধর্ম্মের সাধন। ধর্ম্মজীবনের পক্ষে কোন কর্ম্ম ও চিন্তাই অবজ্ঞেয় নহে। সুতরাং ইহাদের মধ্যে পরস্পর বিরোধ ঘটিতে পারে না। ধর্ম্মানুষ্ঠানসমূহের মধ্যে পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা নাই।

প্রকৃত ধার্ম্মিক জীবনের সকল অনুষ্ঠানকেই অতিপ্রাকৃত ও অতিমানবীয় ভাবের দ্বারা সুন্দর, মহৎ ও অমর করিয়া তুলিতে পারেন। তিনি তাঁহার নৈসর্গিক ক্ষুদ্রত্বের মধ্যে, শারীরিক বন্ধনসমূহের মধ্যে, ইন্দ্রিয়গত চিন্তা ও কর্ম্মসমূহের মধ্যে মুক্তি ও অতীন্দ্রিয় সত্যের প্রভাব উপলব্ধি

প্রকৃত ধর্ম্মজীবনের বিচিত্র সাধন

করেন। তিনি ভোগকে, সংসারকে বর্জ্জন করেন না, ইহাকে ত্যাগের দ্বারা, বৈরাগ্যের দ্বারা সংযত ও সুশৃঙ্খলীকৃত করেন। তিনি প্রবৃত্তির উচ্ছেদসাধন করেন না—সন্ন্যাসের দ্বারা শান্ত ও নিয়ন্ত্রিত করেন। বাহ্য আচার তাঁহার উপেক্ষার বস্তু নহে, রূপকল্পনা তাঁহার অনন্তোপলব্ধির প্রতিবন্ধক নহে। তিনি এই সমুদয় স্বাভাবিক অসম্পূর্ণতার ভিতর দিয়াই অসীম অনন্তের উপলব্ধি করেন। এইরূপে তাঁহার জীবনের সকল কাজেই অনন্তমুখীনতা থাকিয়া যায়; জীবনের সকল অবস্থায়ই, সকল স্তরেই সন্ন্যাস ও সংসারের, বাসনা ও নির্ব্বাণের সামঞ্জস্য ও সমন্বয় সাধিত হইতে থাকে। 'দেহাত্মক বুদ্ধি'র ক্রমিক লোপ-সাধন তাঁহার সমগ্র কার্য্যকলাপের উদ্দেশ্য, সমগ্র জীবনে ত্যাগের নিয়ম পালন তাঁহার একমাত্র সাধনা।

সুতরাং জ্ঞান ও ধর্ম্মের মধ্যে বিরোধ ঘটিতেই পারে না। আয়ুর্ব্বেদই আলোচনা করা হউক, অথবা নাস্তিকতার সমর্থনই করা হউক, ভৈষজ্য প্রস্তুত করাই হউক অথবা রাসায়নিক পরীক্ষাই করা হউক, দর্শনচর্চ্চাই করা হউক বা দেবতত্ত্বের তথ্য সঙ্কলন করাই হউক, পরমাণুবাদ আবিষ্কার করাই হউক, অথবা সমাজের নেতৃত্বগ্রহণই করা হউক, 'প্র্যাগ্‌ম্যাটিজম্' প্রতিষ্ঠা করাই হউক বা কোন কর্ম্মকেন্দ্রের সৃষ্টি ও পরিচালনা করাই হউক,—প্রকৃত ধার্ম্মিকের সকল চিন্তা ও কর্ম্মই অনন্তমুখী, সকলই এই ত্যাগের আকাঙ্ক্ষা, অমৃতের সাধনা, মুক্তির ইচ্ছার দ্বারা পরিচালিত, সকলই ধর্ম্মশাসনে সুনিয়ন্ত্রিত। কাজেই ধর্ম্ম কোন

চিন্তা বা কর্ম্মেরই প্রতিবন্ধক নহে, কোন বিদ্যারই প্রতিদ্বন্দ্বী নহে, কোন বিজ্ঞানেরই বিরোধী নহে।

প্রকৃত ধর্ম্মশিক্ষার উদ্দেশ্য

অতএব ধর্ম্মশিক্ষার জন্য মানবের সমগ্র জীবনের হিসাব রাখিতে হইবে। ভাবিতে হইবে—কি উপায়ে মানুষ ইন্দ্রিয়সুখকে পরমার্থের অধীন করিতে পারে, শরীরকে আত্মার আয়ত্ত করিতে পারে, তাহার নৈসর্গিক ভোগপ্রবৃত্তিকে ত্যাগের আকাঙ্ক্ষা দ্বারা শুদ্ধ, পবিত্র ও সংযত করিতে পারে, তাহার স্বাভাবিক দুর্ব্বলতাকে, সসীম ধারণাশক্তিকে, সঙ্কীর্ণ অনুষ্ঠানগুলিকে অতি-প্রাকৃত ও অসীম উদারতার দ্বারা পূর্ণ, পুষ্ট, সবল ও সজীব করিয়া তুলিতে পারে। ইহাই প্রকৃত ধর্ম্মশিক্ষার যথার্থ উদ্দেশ্য।

কিন্তু মানুষ একেবারেই চরমের ধারণা করিতে পারে না, অসীমের উপলব্ধি করিতে পারে না, সূক্ষ্মতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। তাহার সর্ব্ববিধ ক্ষমতারই সীমা আছে, এ জন্য সকল বিষয়েই সে পঙ্গু। এই কারণে তাহাকে স্থূল সত্য, খণ্ডসত্য, আংশিক তথ্য সংগ্রহ করিতে করিতে অগ্রসর হইতে হয়। তাহার জীবনের সকল বিভাগেই তাহাকে একপ্রকার 'আরোহপদ্ধতি' অবলম্বন করিয়া চলিতে হয়।

আরোহপদ্ধতির ধর্ম্মশিক্ষা-প্রণালী

উদ্ভিদ্‌সমূহের সাধারণ নিয়মগুলি প্রথমেই শিক্ষার্থীর আয়ত্ত হয় না। জড়জগতের পরিবর্ত্তনসমূহের মধ্যে যে কি সত্য নিহিত আছে, তাহা সে একেবারেই উদ্ধার করিতে পারে না। ধর্ম্মজীবনের সমগ্র সত্যও সেইরূপ

কোন মানবই প্রথম উত্থমে অধিকার করিতে পারে না। তাহাকে অন্ধের মত, পঙ্গুর মত, নিঃসহায়ভাবে ক্রমে ক্রমে বিচিত্র পথের ভিতর দিয়া চলিতে হইবে। প্রথমতঃ, দেহকে যত উপায়ে সম্ভব বশী-ভূত করিতে হইবে। শরীরই যখন সকল প্রকার কর্ম্মের ভিত্তি, তখন নানাবিধ সংযমের উপায় অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মচর্য্যের শাসন দ্বারা ইহাকে নিয়মিত ও শান্ত করিতে হইবে। এ জন্য দৈহিক বৃত্তিসমূহ নিরোধ করিবার বিচিত্র কর্ম্ম অভ্যাসের ব্যবস্থা দ্বারা চিত্তের স্থিরতা, ধীরতা ও তিতিক্ষা প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। তাহা হইলেই শারীরিক ও বৈষয়িক ভিত্তি প্রকৃত আধ্যাত্মিকতার, ত্যাগ-মুখীনতার ও অতীন্দ্রিয়তার অনুকূল হইতে পারিবে। দ্বিতীয়তঃ, নানা উপায়ে পরোপকার, ও লোকহিতের বাসনা হৃদয়ে জাগরিত করিয়া দিতে হইবে। ত্যাগ ও সেবার বিচিত্র কর্ম্ম অভ্যাস করিতে করিতে হৃদয় হইতে স্বাভাবিক রূপেই অহঙ্কারের লোপ সাধিত হইবে। এই উপায়ে তাহার বহিরিন্দ্রিয় ও অন্তরিন্দ্রিয় শুদ্ধ হইয়া গেলে জগতের পরম সত্যের উপলব্ধি করিবার পক্ষে মানব যোগ্যতা লাভ করিবে। সেই অবস্থায় অতিমানবীয় ও অতি-প্রাকৃত জীবনের ঘটনাগুলি সে বুঝিতে পারিবে, সর্ব্বদা অসীম ও অনন্তের মধ্যে অবস্থিতি করিয়া অমৃতের ও মুক্তির ভূমানন্দ উপভোগ করিতে পারিবে।

সুতরাং বলা বাহুল্য কোন প্রকার ধর্ম্মগ্রন্থপাঠ ধর্ম্মশিক্ষার প্রধান উপকরণ নহে। মহাপুরুষগণের জীবন-আলোচনা, ধর্ম্ম-ইতিহাসের বিভিন্ন অধ্যায়ের বিবৃতি অথবা ধর্ম্মতত্ত্বের

বিশ্লেষণ ধর্ম্মশিক্ষার মুখ্য উপায় নহে। এতদ্ব্যতীত নানা লোকে মিলিয়া কোনও এক ব্যক্তিকে গড়িয়া তোলা যায় না।

ধর্ম্মশিক্ষার উপকরণ ও অনুকূল অবস্থা

এ জন্য হৃদয়ের যে সম্বন্ধ প্রয়োজন, ভক্তি ও স্নেহের যে বন্ধন আবশ্যক তাহা কেবল ব্যক্তিগত আদানপ্রদানেই সংঘটিত হইতে পারে। তাহা ছাড়া কোন ঐক্যবদ্ধ আইনকানুন এইরূপ ধর্ম্মশিক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারে না। কারণ সাধারণ কোন নিয়ম দ্বারা সকল লোকের উপযোগী বিধি নির্দ্দেশ করিয়া কোন ব্যক্তির ধর্ম্মজীবন গঠন করা যায় না। চরমে প্রত্যেক ব্যক্তির স্বারাজ্যসিদ্ধির জন্য ভিন্ন ভিন্ন সাধন অবলম্বন আবশ্যক। তাহা কোনও ধর্ম্মসমিতির অনুশাসনে সিদ্ধ হইতে পারে না, আর এই জন্য কোনও বিত্যালয়েই প্রকৃত ধর্ম্মশিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে না।

পাশ্চাত্য দেশে যাহাকে 'ডে-স্কুল' বলে আমাদের দেশের আধুনিক বিত্যালয়গুলি সেই শ্রেণীর অন্তর্গত। আর এক প্রকার বিত্যালয় আমাদের দেশে প্রচলিত করিবার চেষ্টা চলিতেছে, তাহাকে সেই সকল দেশে 'বোর্ডিংস্কুল' বলে। সেখানে ছাত্র ও শিক্ষক সর্ব্বদা এক সঙ্গে বাস করে। আমাদের এখানে 'রেসিডেন্‌শ্যাল' প্রথা নামে ইহা অভিহিত। এই দুই প্রথার বিরুদ্ধেই ইহাদের জন্মস্থানে যুক্তিও আছে। সে যাহাই হউক, ইহাদের কোনটিই প্রকৃত ধর্ম্মশিক্ষার অনুকূল নহে। দ্বিতীয় প্রথায় সামাজিকতার কথঞ্চিৎ বিকাশ হয় বটে। কিন্তু ইহাতেও প্রত্যেক শিক্ষার্থীর বিচিত্র ধর্ম্ম-জীবনের বিকাশ ও পুষ্টি সাধনের ব্যবস্থা হইতে পারে না।

বৈচিত্র্যের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে হইলে, সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র আয়োজন করা প্রয়োজন। শিক্ষার্থীর প্রতিদিনকার প্রত্যেক কর্ম্ম ও চিন্তা তাহার শিক্ষকের চিত্তে স্থায়িরূপে প্রবেশ করা আবশ্যক। এই কাজ আফিসের কেরাণীর রিপোর্টে সুসিদ্ধ হইতে পারে না। মুদ্রিত ফল-বিজ্ঞাপনপত্রের সাহায্যে শিক্ষার্থীর সমগ্র জীবনের চিত্র অঙ্কিত হইতে পারে না। যদি কোন ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে শিক্ষার্থীরা সমবেত হইয়া তাহাদের সমগ্র জীবনের কর্ত্তব্য শিক্ষার জন্য তাঁহার উপদেশের প্রার্থী হয়, যদি কোন ব্যক্তি শিক্ষার্থীকে উৎসবে, রোগে, পারিবারিক কার্য্যকলাপে, সেবায়, শুশ্রূষায় সঙ্গী, সহায়, সেবক ও ভৃত্য ভাবে পরীক্ষা করিতে, তাহার প্রবৃত্তি সমূহ নিয়মিত করিতে সুযোগ পান, যদি তাহার সম্পূর্ণ সাধনার জন্য সেই ব্যক্তি একাকী দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারেন তাহা হইলেই এরূপ অন্তর্মুখী, বৈরাগ্যমূলক ধর্ম্মজীবন গঠনের অনুকূল ক্ষেত্র প্রস্তুত হইতে পারে। এই প্রথাকে 'ডোমেষ্টিক' বা গুরুগৃহবাসরীতি বলা যাইতে পারে।

গুরু-গৃহ

অতএব যাঁহারা ধর্ম্মশিক্ষার জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে হয় প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতির আমূল পরিবর্ত্তন করিতে হইবে, অথবা ধর্ম্ম-শিক্ষার চেষ্টা একেবারে পরিত্যাগ করিতে হইবে। বিশ্ববিদ্যালয়কে কেবল মাত্র পরীক্ষামন্দির না রাখিয়া প্রকৃত শিক্ষামন্দিরে, 'টীচিং-ইউনিভার্সিটি'তে পরিণত করিলে জ্ঞানের মাত্রা বৃদ্ধি হইতে পারে, ত্যাগের আকাঙ্ক্ষা

শিক্ষাপদ্ধতির আমূল পরিবর্ত্তন আবশ্যক

বিকশিত হইবে না। শিক্ষক ও ছাত্রের একত্র বাসের ব্যবস্থা করিলে একটুকু লৌকিকতা ও সৌজন্যশিষ্টাচার এবং সামাজিকতার শিক্ষা হইতে পারে, কিন্তু জীবনের সাধনা খুঁজিয়া বাহির করিবার সুযোগ ঘটিবে না।

নূতন নূতন বিশ্ববিদ্যালয় সৃষ্টির দিনে আমি যে অপরূপ প্রস্তাবের উত্থাপন করিতেছি, তাহাতে অনেকেই হাস্য সংবরণ করিতে পারিবেন কি না সন্দেহ। যে সময়ে পৃথিবীর সর্ব্বত্র মানুষ গড়িবার জন্য বড় বড় 'ফ্যাক্‌টরী' খুলিবার বিপুল আয়োজন চলিতেছে, শিক্ষার বৃহৎ বৃহৎ প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়া এক সঙ্গে বহু ফল প্রসবের ব্যবস্থা হইতেছে, সেই উন্মাদনার যুগে পরিবার-বদ্ধ শিক্ষানীতি, গৃহ-গত বিদ্যাদানরীতি উপেক্ষিত হইবারই সম্ভাবনা। গুরুগৃহে কতটুকুই বা শিক্ষা হইতে পারে? কয়জনই বা শিখিতে পারে, কয়টা বিষয়ই বা শিখান যাইতে পারে? গুরু-শিষ্যে হৃদয়গত সম্বন্ধ না হয় প্রতিষ্ঠিত হইল, কিন্তু সমগ্রদেশের শিক্ষার ভার কি ইহার দ্বারা নির্ব্বাহিত হইতে পারে? ইহাতে যে ঘোর অনৈক্য ও বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করিবে! বিভিন্ন গুরুগৃহের পাঠ-চর্চ্চা ও পরীক্ষা-প্রণালীর হিসাব রাখিবে কে? গৃহস্থ হইবার সময় সমাজ শিক্ষার্থীকে সম্মান করিবে বা তাঁহার বিদ্যা ও চরিত্রের মূল্য নির্দ্ধারণ করিবে কি উপায়ে?

এই সকল প্রশ্নের উত্তর প্রাচীন ইউরোপ দিতে পারিত না, মধ্য যুগের এবং বর্ত্তমান কালের ইউরোপ এই সমুদয় তত্ত্ব আলোচনা করিতে অসমর্থ। আমেরিকার শিশু সভ্যতা এই শিক্ষাপদ্ধতিকে

আদিম মানবসমাজের সরল-সহজ প্রতিষ্ঠান বলিয়া গায়ে হাত বুলাইবে মাত্র। জগতের ইতিহাসে এই সমুদয় সমস্যার মীমাংসা করিয়াছে—এক ভারতবর্ষ। ভারতবর্ষ যে বিচিত্র শিক্ষাপদ্ধতি আবিষ্কার করিয়াছিল, তাহাতে ধর্ম্ম ও জ্ঞানের মধ্যে পরস্পর-বিরোধের সামঞ্জস্য করিতে হইত না, তাহাতে ধর্ম্মের জন্য কোন গ্রন্থপাঠ একান্ত আবশ্যক ও একমাত্র উপাদান বোধ হইত না, তাহাতে ধর্ম্মের ব্যবস্থা করিবার জন্য দশে পাঁচে মিলিয়া কমিটি গঠন করিতে হইত না, তাহাতে ব্রহ্মচারীর ধর্ম্মভাব উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য শিক্ষক-সম্মিলন, 'টীচার্স বোর্ড' বা ছাত্রাবাস-শাসনসমিতি, হোষ্টেল-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের প্রয়োজন হইত না।

এই নূতন শিক্ষাপদ্ধতি ভারতবর্ষের পক্ষে নূতন নহে

শিক্ষাজগতের সেই অপূর্ব্ব আবিষ্কার, ভারতবর্ষের সেই বিশিষ্ট দান উঠিয়া গেল কেন? সেই শিক্ষাপদ্ধতি দ্বারা কি ভারতীয় মানবের বিবিধ অভাব দূর হইত না? তাহার সাহায্যে কি ভারত-সমাজের স্বভাবোপযোগী বিধি ব্যবস্থা করা যাইত না? তাহার নিয়মে কি যুগপরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে নূতন নূতন বিদ্যার, নূতন নূতন বিজ্ঞানের, নূতন নূতন দর্শনের আলোচনা হইত না? তাহার নিয়মে কি প্রদেশভেদে, ভাষাভেদে বুদ্ধিশক্তির বিকাশভেদে শিক্ষণীয় বিষয়ের বৈচিত্র্য অনুষ্ঠিত হইত না,—আলোচনাপ্রণালীর বিভিন্নতা সাধিত হইত না? তাহার প্রভাবে কি শিক্ষার্থীরা কেবল বৈরাগী ফকীর হইয়া গুরুগৃহ হইতে সমাবর্ত্তন করিত?

প্রাচীন ভারতে শিক্ষা

তাহার ফলে কি সংসারের বিচিত্র ভোগ্য বস্তুর সৃষ্টি হইত না— ভোগের আকাঙ্ক্ষা তৃপ্ত করিবার জন্য বিচিত্র শিল্পও ব্যবসায় অবলম্বিত হইত না? তাহার দ্বারা কি রাষ্ট্রীয় কর্ম্মে সহায়তা করিবার উপযোগী জ্ঞান লাভ হইত না? তাহার বিধানে কি শবচ্ছেদ করা হইত না?—উদ্ভিদ্‌বিদ্যা অধীত হইত না?—জড়-জগতের তথ্য সংগৃহীত ও আলোচিত হইত না?—রাসায়নিক প্রক্রিয়াগুলি পরীক্ষা করা হইত না?

তাহা না হইলে ভারতবর্ষে এতগুলি ধর্ম্মবিপ্লব হইল কি উপায়ে? তাহা না হইলে ভারতসমাজে বিভিন্ন জাতি মিশ্রিত ও অঙ্গীভূত হইয়া গেল কি উপায়ে? তাহা না হইলে ভারত মহা-দেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত এক বিচিত্র সামাজিক ও ধর্ম্মজীবন প্রতিষ্ঠিত হইয়া সকলকে শৃঙ্খলীকৃত ও ঐক্যবদ্ধ করিল কি উপায়ে? তাহা না হইলে আপামর জনসাধারণ ধর্ম্মের কথা, নীতির উপদেশ, দেবদেবীর আরাধনা, সমাজপ্রতিষ্ঠা, পরিবাররক্ষা, বিষয়কর্ম্ম শিখিল কি উপায়ে? নিম্নশ্রেণীর মধ্যে বিভিন্ন যুগে নূতন নূতন আকাঙ্ক্ষা জাগরিত হইয়া নূতন নূতন ভাষা, নূতন নূতন পুরাণ-তন্ত্র-সংহিতা, নূতন নূতন দেবতত্ত্ব সৃষ্টি করিল কি উপায়ে? তাহা না হইলে চিকিৎসা, রঞ্জনশিল্প, বয়নকার্য্য, মন্দির-প্রতিষ্ঠা, মূর্ত্তিগঠন, নৌবাণিজ্য, অস্ত্রশস্ত্রনির্ম্মাণ প্রভৃতি জড়বিজ্ঞান-মূলক কাজ কর্ম্ম চলিত কি উপায়ে? তাহা না হইলে কি মহা-রাষ্ট্র ও পঞ্চনদ, আন্ধ্র ও বঙ্গদেশের অধিবাসিবৃন্দ বিভিন্ন ভাষায় কথা কহিয়া, বিভিন্ন সাহিত্যের পুষ্টি বিধান করিয়া, বিচিত্র রীতি-

নীতি, বিচিত্র ধর্ম্মকর্ম্ম, বিচিত্র সামাজিক প্রথা অবলম্বন করিয়াও সকলকে এতকাল একই সভ্যতা ও সমাজ-কলেবরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ মনে করিতে পারিত?

যুক্তিকে অবজ্ঞা না করিলে বলিতে হইবে—ভারতবর্ষের শিক্ষা-পদ্ধতি কালধর্ম্মের অনুসারে নিজকে গুছাইয়া লইতে পারিত। ইতিহাসের সাক্ষ্য বিশ্বাস করিলে বলিতেই হইবে—ভারতবর্ষে যুগে যুগে নব নব অবস্থা-সংঘটনের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষকগণ উপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়া লইতে জানিতেন। তাহারই ফলে ভারতবর্ষের বিদ্যালয়-সমূহ আজকালকার অক্‌স্‌ফোর্ড, বার্লিন্ এবং আমেরিকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যায় সমগ্র পৃথিবীর শিক্ষালয় হইতে পারিয়াছিল—ভারতবর্ষের পল্লীসমূহ সেই সময়কার চিন্তাজগতের রাজধানী হইয়া বিরাজ করিতেছিল।

ভারতীয় শিক্ষা-পদ্ধতির ফল

তাহারই ফলে ভারত-বর্ষের শিল্পব্যবসায় ও কারুকার্য্য দেশের অভাবমোচন করিয়া পৃথিবীতে অন্ন, বিলাস ও সভ্যতা [illegible] করিতে পারিত। ভারতীয় পল্লীর গুরুগৃহে শিক্ষাপ্রাপ্ত গ্র্যাজু[illegible]গণ রাষ্ট্রগঠন করিতেন, বৈষয়িক জীবনের ধুরন্ধর হইতেন, সাম্রাজ্য-নীতির সংস্থাপন করিতেন, ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রবর্ত্তক হইতেন। তাহারই ফলে তাঁহারা মহাভারতের, এবং ভারতবর্ষের বাহিরে বৃহত্তর ভারতের প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইয়া অশিক্ষিতকে শিক্ষিত, বর্ব্বরকে সৌজন্যবান্, অসভ্যকে সুসভ্য করিয়া তুলিয়াছিলেন। তাহারই ফলে তাঁহারা সমাজবিজ্ঞান ও মনস্তত্ত্বে পারদর্শী হইয়া লোকের ধারণা-শক্তি ও প্রবৃত্তির বিকাশ অনুসারে সমাজে বিচিত্র ধর্ম্মপ্রণালী,

বিচিত্র পূজাপদ্ধতি ও বিচিত্র ধর্ম্মানুষ্ঠানের প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। তাহারই ফলে আমাদের আদর্শ নরপতি—

"জুগোপাত্মানমত্রস্তো ভেজে ধর্ম্মমনাতুরঃ।
অগৃধ্নুরাদদে সোঽর্থমসক্তঃ সুখমন্বভূৎ॥"

তাহারই ফলে ভারতীয় প্রদেশসমূহেব ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক বিভিন্নতা অনুসারে তাঁহারা ধর্ম্মবন্ধনেব ও সমাজব্যবস্থার বৈচিত্র্য রক্ষা করিতেন। আর এই জন্যই ভারতবর্ষে কখনও প্রতিভা-সম্পন্ন চরিত্রবান্ নরনারীর অভাব হয় নাই। আর্য্যযুগের বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্র হইতে রামপ্রসাদ, রামকৃষ্ণ পয্যন্ত,—পাণিনি, চাণক্য হইতে চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার পর্য্যন্ত, মৈত্রেয়ীর কাল হইতে অহল্যাবাই, রাণীভবানী পর্য্যন্ত,—চন্দ্রগুপ্ত হইতে শিবাজী পর্য্যন্ত বিচিত্র কর্ম্মক্ষেত্রের জন্য বিচিত্র চিন্তাবীর ও কর্ম্মবীর আবির্ভূত হইয়া ভারতের জাতীয় চেতনাকে জাগ্রত করিয়া ছেন, ভারতবর্ষের সাধনাকে বিভিন্ন অবস্থার মধ্য দিয়াই অ..., অক্ষয় ও জীবন্ত করিয়া রাখিয়াছেন।

আর আধুনিক যুগের মানবসমাজকে এই শিক্ষা প্রদান করিবার জন্যই ভারতবর্ষ এখনও বাচিয়া আছে। পৃথিবীতে যে সকল দেশে প্রাথমিক শিক্ষায় প্রত্যেক ব্যক্তির অধিকার ও সুযোগ আছে, তাহাদের শিক্ষাপদ্ধতিও ইহার দ্বারা সম্পূর্ণ করিতে হইবে। জার্ম্মাণির শিল্প-বিদ্যালয়ে, আমেরিকার কৃষি-কলেজে, এই বিচিত্র বাণীপ্রচারের জন্য ভারতবর্ষ এখনও তাহার বৈচিত্র্য ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতেছে। এই শিক্ষাপদ্ধতি এখনও সম্পূর্ণ

লুপ্ত হইয়া যায় নাই, কেবল যত্নাভাবে মলিন ও নিস্পন্দ হইয়া রহিয়াছে। ভারতবর্ষ তাহাকে সঞ্জীবিত করিয়া পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করিবে। এই নূতন যুগের মানব-জাতি অন্যান্য দেশে কয়েকটি বিদ্যা ও শিল্পের বিশেষ উৎকর্ষ সাধন করিয়াছে—তাহা এই দেশের পক্ষেও একেবারে নূতন নহে। সেই সমুদয় সত্যও এই শিক্ষাপদ্ধতি নিজের অঙ্গীভূত করিয়া লইয়া নিজের বিশিষ্ট উপায়ে এই সমাজে প্রচলিত করিবে।

মানবের ভবিষ্যৎ ও আধুনিকভারত

আমরা নূতন নূতন শিল্পের সন্ধান পাইতেছি; রেলগাড়ী, ষ্টীম-এঞ্জিন, ছাপাখানা, তড়িৎশক্তির প্রভাব দেখিতেছি; স্বায়ত্তশাসনের, রাষ্ট্রীয় ঐক্যের সংবাদ পাইতেছি। কিন্তু এই সমুদয় আসিয়া ভারতবর্ষকে অভিভূত করিতে পারিবে না—ইহাদের উৎকট ক্ষমতার নিকট ভারতবর্ষ আত্মসমর্পণ করিবে না—ভারতবাসী ইহাদের প্রভাবে স্বাতন্ত্র্য হারাইয়া বিশ্বকে দরিদ্র করিবে না। আমরা রেলগাড়ী আয়ত্ত করিব, মুদ্রাযন্ত্র গ্রহণ করিব—প্রতিদ্বন্দ্বিতা, অসাম্য এবং জীবন-সংগ্রাম বৃদ্ধি করিবার জন্য নহে, দ্রুতগতিতে সমগ্র পৃথিবী ভাবুকতার দ্বারা অভিভূত করিবার জন্য—ধর্ম্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে দিগ্বিজয়ের সুবিধাসৃষ্টির জন্য। আমরা শিল্পের উন্নতি বিধান করিব, নবাবিষ্কৃত বিজ্ঞানালোচনায় যত্ন করিব—পার্থিব সুখভোগের দাস হইবার জন্য নহে,—নূতন নূতন নিষ্কাম কর্ম্মের পন্থা আবিষ্কারের জন্য। আমরা স্বদেশকে ভালবাসিব, জাতীয় সভ্যতার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিব—বিরোধ ও বিদ্বেষকে প্রশ্রয় দিবার জন্য নহে, মানবসমাজের বৈচিত্র্য ও

ভগবানের ঐশ্বর্য্য প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য। আমরা বিজ্ঞানসম্মত শাসনপ্রণালী অবলম্বন করিব—ইউরোপের অনুকরণে সমাজগঠনের জন্য নহে, পাশ্চাত্য সমাজ-তত্ত্বের 'বুকনি' লাগাইয়া জগৎকে বিজ্ঞান ও প্রকৃতিপুঞ্জের স্বায়ত্তশাসনের সঙ্গে ভক্তি, বৈরাগ্য ও প্রেমের অদ্ভুত সমন্বয় বুঝাইবার জন্য।

আমরা দেখাইব যে সাম্য—যথেচ্ছাচারও অনৈক্যের নামান্তর মাত্র নহে, ভেদবুদ্ধি ও অসাম্য মাত্রই—ঐক্য, সহানুভূতি ও প্রেমের প্রতিবন্ধক নহে,—আমরা জগৎকে দেখাইব যে সারা

ভারতবর্ষের বাণী

জীবন সংসারের কর্ম্মে ব্যয় করিয়াও যথাসময়ে সকল বাসনা ত্যাগ করা যায়, জড়জগতের তথ্য আলোচনা করিয়াও ভগবদ্ভক্তির অনুশীলন করা যায়, বিজ্ঞানে পণ্ডিত হইয়াও বিচিত্র নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া আস্তিক্যবুদ্ধি রক্ষা করা যায় এবং গার্হস্থ্যাশ্রমে রাষ্ট্রের পরিচালক, সমাজের নায়ক ও বৈষয়িক ব্যাপারসমূহের ধুরন্ধর হইয়াও বার্দ্ধক্যে মুনিবৃত্তি অবলম্বন করিয়া অবশেষে যোগাভ্যাস দ্বারা তনুত্যাগ করা যায়।

হিন্দুসমাজ সেই উদ্দেশ্যেই বাঁচিয়া আছে। জগতে ভারতীয় প্রভাব বিস্তৃত হইলেই ইউরোপের ভারতে পদার্পণ সার্থক হইবে, কারণ তাহারই পরে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যসম্মিলনের প্রকৃত ফল ফলিতে আরম্ভ করিবে। আধুনিক যুগোপযোগী ভারতগঠনের অর্থ ইউরোপের অনুকরণ নহে—ভারতের স্বকীয় আত্মপ্রকাশ, নিজ বিশেষত্বের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা।

বিশ্ব-মানবের হৃদয়মধ্যে আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছে—যন্ত্র ও উপলক্ষ্যের অভাব হইবে না।
